২৮ এপ্রিল ২০২৩

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

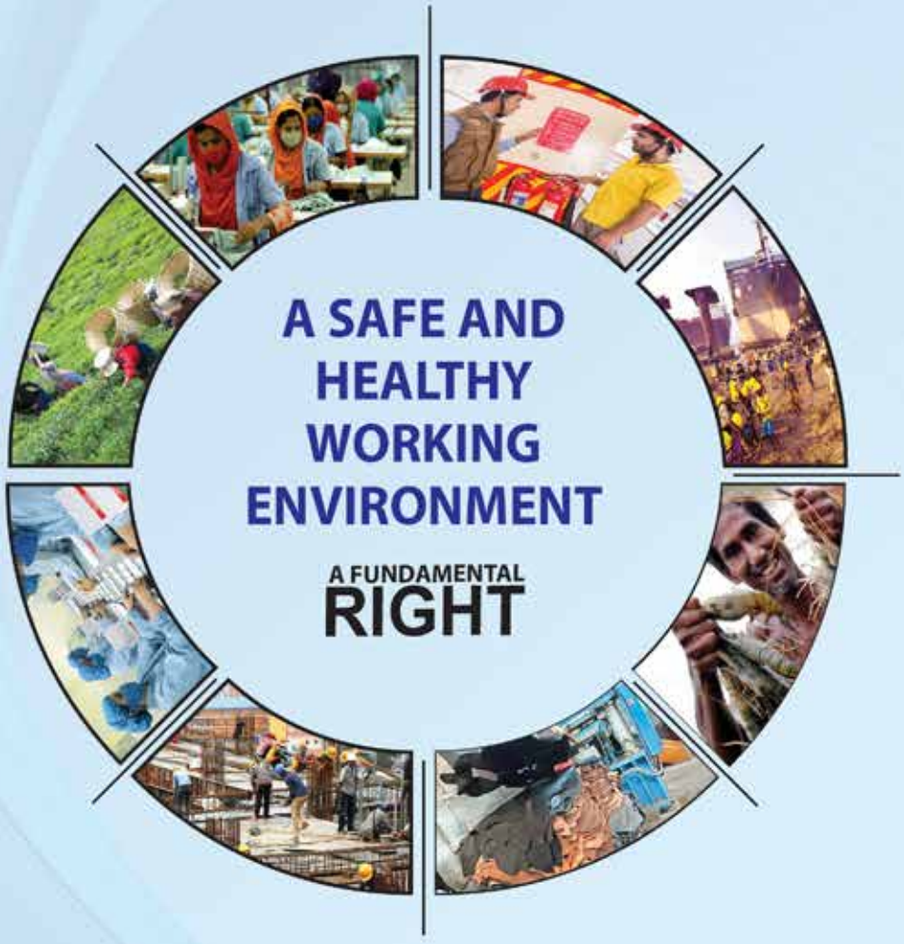

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৮ এপ্রিল ২০২৩

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

Department of Inspection for Factories & Establishments

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands

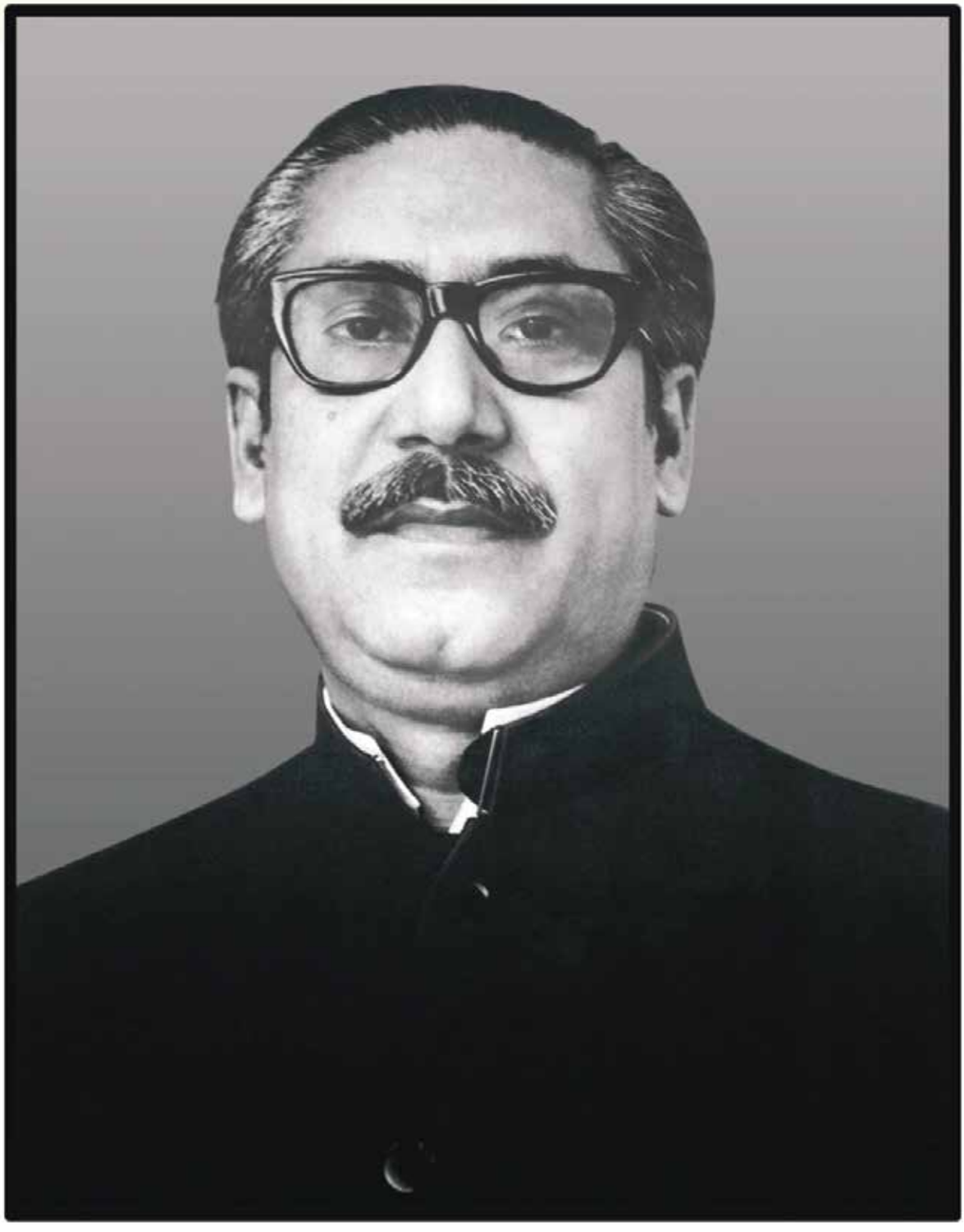

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৫ বৈশাখ ১৪৩০
২৮ এপ্রিল ২০২৩

বাণী

দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পর তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্যপদ লাভ করে। একই বছর তিনি শ্রমনীতি ঘোষণা করেন এবং আইএলও'র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা শিল্প মালিক ও সরকারের দায়িত্ব। সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫'।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসকল কল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশে বিগত এক দশকে শিল্প-কারখানার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণসহ কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ নিতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে দেশীয় ও বৈশ্বিক শ্রমমান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৫ বৈশাখ ১৪৩০
২৮ এপ্রিল ২০২৩

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩' এর প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' যথেষ্ট সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শ্রমিক কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। শিল্প শ্রমিক মজুরি কমিশন গঠন, বিভিন্ন সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শ্রম পরিদপ্তর পুনর্গঠন, জাতীয় শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মে দিবস পালনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন এবং সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। জাতির পিতার উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত ১৪ বছরে শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড বজায় রাখতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। আমরা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন ও হালনাগাদ করেছি। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' এবং 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠায় আমরা নিয়মিত শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ ও সেইফটি কমিটি গঠন করেছি। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আমরা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন এবং মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল নির্মাণ করেছি। শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলার ক্ষেত্রে আইএলও এর সহায়তায় আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গাইডলাইন তৈরি করি। চালু করা হয় টেলিমেডিসিন সেবা। আমাদের সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ ও উদ্যোগের ফলে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটেগরিতে উন্নীত হয়েছে। আমরা সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। এই অদম্য অগ্রযাত্রায় দেশের শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি, 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৮ এপ্রিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে ৮ম বারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ।'

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে স্মার্ট ইকনমি গড়তে হবে। স্মার্ট ইকনমি গড়ার প্রধান কারিগর হিসেবে কাজ করবে এদেশের শ্রমিক ভাই ও বোনেরা। দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মপরিবেশ শোভন ও নিরাপদ করার বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার মাধ্যমে স্মার্ট ও উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও সচেতনতায় এ অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল দপ্তর ও সংস্থা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কর্মক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কেবল সরকারি উদ্যোগে শোভন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা কঠিন। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় বর্ণিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক পালনীয় বিষয়গুলো সকল কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নে সকলকে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিধিসমূহ পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে গৃহীত সকল কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য শোভন কর্মপরিবেশ, টেকসই উৎপাদন, টেকসই শিল্পায়ন ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আনিসুল হক, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিবারের ন্যায় ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় দিবসটি উদযাপনে আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি নিপীড়িত, নির্যাতিত, অধিকারহারা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সদ্য স্বাধীন দেশে সংবিধান প্রণয়নকালে বঙ্গবন্ধু সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকারের বিষয় সুদৃঢ় করেন। জাতির পিতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা- আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭২ সালেই শ্রমনীতি প্রণয়ন এবং আইএলও এর ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। এ সকল পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা। তিনিই ১৯৭৩ সালে পহেলা মে'কে 'মহান মে দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা আইএলও এর সব ক'টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনকারী দেশ।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতন হতে মালিক-শ্রমিক, সরকার সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমুখী কার্যক্রম দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। সরকার শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট দেশে পরিণত করতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিধিসমূহ পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শ্রমনির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে কলকারখানায় উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে বাড়বে, সমৃদ্ধ অর্থনীতির দিকে দেশ এগিয়ে যাবে।

পরিশেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনাসহ সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

সভাপতি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

‘নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ’- প্রতিপাদ্য নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশে অষ্টমবারের মতো ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩’ পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ভাই-বোনসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের নিকট সঠিক বার্তা পৌঁছে দেবে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অবদান অপরিসীম। স্মার্ট ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা এবং সেইফটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সকল শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবো।

বর্তমান সরকার শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ সৃজনের প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। এজন্য শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে নানামুখী কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল পালিত এই দিবস শ্রমিক, মালিক ও সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতন করবে এবং এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবে। সকল পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি অনুশীলনের মাধ্যমেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জিত হবে।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মুজিবুল হক

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান শিল্পখাতের মূল শক্তিই হলো তার মানবসম্পদ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রযুক্তিতে অগ্রসর যে বাংলাদেশের চিত্র আমরা দেখতে পাই তার অন্যতম প্রধান নিয়ামক আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প। শিল্পায়নের অগ্রগামিতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিপুল এই মানবসম্পদের কর্মসংস্থান তৈরিতে, তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতে, তাঁদের পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর আমরা জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করি। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ।'

সভ্যতার ইতিহাসে আমরা এখন প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শিল্পযুগকে অতিক্রম করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। মূলত অটোমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এই যুগে সভ্যতার যে পরিবর্তন সাধিত হবে তার প্রভাব পড়বে আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনাসহ সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের উপর। স্বয়ংক্রিয় এই শিল্পধারার সাথে মানিয়ে নিতে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এখনই। সভ্যতা কালের বিবর্তনে আপন গতিতে পরিবর্তিত হবেই। পরিবর্তনের সাথে স্বকীয়তা বজায় রেখে মানিয়ে নেয়াই আধুনিক প্রগতিশীলতা। ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে যেমন নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে আবার একই সাথে অদক্ষ, শ্রমবিমুখ, নতুন উদ্ভাবনে অনুপোযোগী শ্রমিক বাজার হারাবে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা একদিকে যেমন আমাদের একটি স্থবির পৃথিবীর মুখোমুখি করেছিল, একইভাবে ভার্চুয়াল জগতের দ্বার উন্মোচন করে নতুন পৃথিবীতে মানিয়ে নেয়ার, কর্মজগতের নতুন ডাইমেনশনে অভিযোজিত হবার প্রক্রিয়ার সাথে একীভূত করেছে। আমরা ঘরে বসেই ১৬ ইঞ্চি স্ক্রিনে অন্তর্জালের দুনিয়ায় ব্যবসা পরিচালনা থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত করেছি। হয়তো নিউ নরমালের এই বাস্তবতাই আমাদের সুপার ইন্টেলিজেন্স এর যুগে প্রবেশের প্রথম ধাপ অতিক্রম করিয়েছে। একমাত্র দক্ষ, পরিশ্রমী এবং নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম কর্মীরাই পারবে এই প্রযুক্তিযুগের নিয়ন্ত্রক হতে।

নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই বিকেএমইএ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে একত্রিত হয়ে নীটসেক্টরের কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই পরিবেশ ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনালগ্নে দক্ষ, পরিশ্রমী, উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমসম্পদই হতে পারে বাংলাদেশের নীট শিল্পের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার একমাত্র হাতিয়ার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' তৈরির স্বপ্ন পূরণে আমরাও অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ,কে,এম, সেলিম ওসমান, এমপি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হয়। সকল কর্মক্ষেত্রে কাজের শোভন পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে এবছর দিবসটি পালিত হচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট ইকোনমি' গড়ার প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়টি বর্তমানে পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় ইতোমধ্যে ৬৪৯৭টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI)- এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

শ্রমিক ভাই-বোনদের শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে শ্রম বিষয়ক হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়েছে। এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়। শিশুশ্রমমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং মাঠ পর্যায়ে তদারকির মাধ্যমে ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা শিল্প এবং রেশম খাত থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দিবসটি পালনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)সহ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের কারিগরি সহায়তার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবছর জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপনের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি।

মোঃ এহছানে এলাহী

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালন করা হচ্ছে। ২০২৩ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ।' নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিবসের প্রাক্কালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ হতে আমি সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জনের পর শোভন কর্মপরিবেশ, টেকসই অর্থনীতি নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। দেশে উল্লেখযোগ্যহারে কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। শিল্প কলকারখানার মূল চালিকা শক্তি হলো শ্রমিক শ্রেণি। এজন্য দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শিল্প কলকারখানায় শোভন, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজনের কোন বিকল্প নেই। আর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, কল্যাণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI) নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম দেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলি, সেইফটি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, মাতৃত্বকল্যাণ, অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করার জন্য কারখানা, দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান প্রভৃতি পরিদর্শন করে। ইতোমধ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ মোতাবেক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি করে। আগামীর বাংলাদেশ শোভন কর্মপরিবেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করবে। এই দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ।' প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী ও যথার্থ বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য শোভন কর্মপরিবেশ, টেকসই উৎপাদন, টেকসই শিল্পায়ন ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বজায় রাখাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে অনুধাবন করতে হবে। বাংলাদেশে বিগত এক দশকে শিল্প-কারখানার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংখ্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' কেবল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে জড়িত। শ্রমিক শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেই তার মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে এবং শরীর ও মন ভালো থাকলেই কাজে তার প্রভাব পড়বে অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে তার থেকে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হবে। তাই স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। টেকসই শিল্প গড়ে তুলতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

খালেদ মামুন চৌধুরী, এনডিসি

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩' উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবারের সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আমি গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে টেকসই উন্নয়নের বিকল্প নেই। আর এই টেকসই উন্নয়ন, স্মার্ট অর্থনীতি, রূপকল্প ২০৪১ সাল অনুযায়ী উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন টেকসই শিল্পায়ন। টেকসই শিল্পায়নের মূল চালিকা শক্তি বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ।

আমি মনে করি কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রাপ্তি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানসম্পন্ন উৎপাদনশীলতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

২০২২ সালে ফায়ার সার্ভিস ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতে ১৮৭৯টি ভবনের ছাড়পত্র ও ৯৩৩টি ভবনের ফায়ার সেইফটি প্লান অনুমোদন দিয়েছে এবং ৫৭৪২১টি ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করে। এছাড়া ভবনের ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য পরিদর্শন ও গণসংযোগ, সার্ভে, মহড়া করে থাকে ফায়ার সার্ভিস। ২০২২ সালে ৫৮৬৯টি ভবন পরিদর্শন করে এর মধ্যে সন্তোষজনক হিসেবে ৩০৯৬টি, ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১৬০৬টি, অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৬১৭টি ভবন চিহ্নিত করা হয়। যা নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করে শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভবনের সেইফটি নিশ্চিত করলেই শ্রমজীবী মানুষের পূর্ণাঙ্গ নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি হয় না। আপদকালীন ভবনের অধিবাসীদের সাড়া প্রদানের দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। ২০২২ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সারাদেশে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ১৩৩৯২টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৬৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। যা শ্রমিকের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত ও জনসচেতনতায় বিশেষ অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এই অর্জনে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। আর এই শ্রমজীবীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অংশ হওয়ায় গর্বিত।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩' উদযাপনের সকল কার্যক্রম কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে গুণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় একধাপ এগিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জয় বাংলা।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন
বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি, জি, এমফিল

International Labour Organization

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

The impact of economic crisis and industrial accidents has limited the progress of Occupational Safety and Health (OSH) and the implementation of the OSH National Plan of Action.

Occupational accidents and diseases have devastating impact on workers and industries. Despite many improvements, the prevention of accidents and work-related diseases continues to have considerable importance in Bangladesh.

Occupational Safety and Health (OSH) is a right of every worker. The International Labour Organization (ILO) recognizes OSH as a fundamental human right and has included the Occupational Safety and Health Convention, No. 155 and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, No. 187 as fundamental conventions.

This decision reaffirms the constitutional obligation of ILO Members to promote, respect and realize the principles contained in these two Conventions, which require members to progressively set up national OSH policies, programmes, and systems and to build a national preventative safety and health culture. It emphasizes the importance of prevention, risk assessment, and worker participation in ensuring safe and healthy working conditions.

Bangladesh has developed OSH Policy (2013) which is currently being reviewed and updated. The national OSH Profile (2019) has also been adopted. Together, the policy, profile and plan of action on OSH are good foundations toward Bangladesh ratifying conventions 155 and 187. This ratification process requires support of government, employers', and workers' organizations. I firmly believe that the government of Bangladesh will take necessary steps toward to ratification.

This year, the world day for Safety and Health at work focuses on a safe and healthy working environment as a fundamental principle and right at work.

The ILO's 'Improving Working Conditions in the Ready-made Garment Industry' programme, funded by the Netherlands and Canada, collaborated with the government, employers, workers organizations and other stakeholder to provide technical support for the development of an OSH legislative framework for Bangladesh.

As we move forward, it is important to continue to prioritize OSH for workers. This translates to the prioritization and execution of the OSH National Plan of Action to build a safety culture in the country.

On this day, let us reaffirm our commitment to creating safe and healthy working environments for all as a fundamental principle and right at work.

Tuomo Poutiainen

Lilly Nicholls
High Commissioner
Canada High Commission

Canada

Anne van Leeuwen
Ambassador, Embassy of
the Kingdom of the Netherlands

Kingdom of the Netherlands

Joint Statement by Development Partners

The 2023 World Day for Safety and Health at Work in Bangladesh will focus on ensuring decent workplace to build a smart Bangladesh. The export oriented sectors particularly RMG has made impressive progress to contribute to Bangladesh's economic development. This contribution is reflected in the journey of Bangladesh to work towards the graduation from Least Developed country to Upper Middle Income Country. With this, new opportunities will emerge as well as challenges to make workplace of Bangladesh's safe and smart.

We commend the initiatives undertaken by Government of Bangladesh to ensure a safe and healthy workplace. In line with Government of Bangladesh's agenda for digitizing systems and making a smart Bangladesh, the Embassy of Kingdom of Netherlands in Bangladesh along with the High Commission of Canada, is supporting the technical development of Labour Inspection Management Application (LIMA) through the "Improving Working Conditions in the Ready-made Garment" program that is implemented by the ILO. With regards to timely inspection and digitizing Occupational Safety and Health (OSH) system, Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) has operationalized LIMA in around 31 offices across Bangladesh. The technical support has been extended to upgrade LIMA in a way that allows DIFE for proactive and follow up inspection, better complaint management system and safer occupational accident reporting. We are pleased to note that DIFE is using LIMA data for reporting and monitoring purpose as well as aligning SOPs on labour inspections and complaint management.

It is imperative to focus on a safe and healthy working environment as it is a fundamental principle and right at work. We, as the development partners of Bangladesh, believe that a decent workplace will create pathway for more economic development.

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। কেননা করোনা মহামারির কারণে বিগত কয়েক বছর যাবত দিবসটির আয়োজন সীমিত পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় এবারের আয়োজনটি অন্যমাত্রা পাবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ।' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এখন কাজ করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের শিল্পখাতে অবশ্যই কাজের একটি ভালো জায়গা তথা শোভন কর্মপরিবেশের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে মালিকরাও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের কাজ করে চলেছেন, যাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগও নিরাপদ থাকে। এক্ষেত্রে সরকার, মালিক, শ্রমিক ও অন্যান্য অংশীজনকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে। আমরা যদি করোনা মহামারির সময়কে বিবেচনায় নেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, সকলের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকলে যেকোনো সমস্যাই আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। চলমান অগ্রগতির এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আমাদের সকলের আরো জোরালোভাবে কাজ করে যেতে হবে।

শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সাথে উৎপাদনশীলতা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। শ্রমিক শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেই তার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং কাজের ক্ষেত্রে তার মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হবে। সেই সাথে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে আমরা আমাদের গুণগতমানসম্পন্ন পণ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুসংহত করতে একধাপ এগিয়ে যাবো। বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে গৃহীত সকল পদক্ষেপকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

সর্বশেষ, দিবসটি উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

আরদাশীর কবির

সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য সামনে নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন করে আসছে।

সরকারের এই জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

টেকসই শিল্প গড়ে তুলতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

বিজিএমইএ বিশ্বাস করে যে, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা শ্রমিক ভাইবোনদের অন্যতম মৌলিক অধিকার – শোভন কাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করতে ও শ্রমিক ভাইবোনদের স্বাস্থ্যগত কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিজিএমইএ সবুজ শিল্পায়নেও নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। আমাদের এখন ১৯২টি লিড গ্রিন কারখানা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ৬৮টি প্লাটিনাম রেটেড এবং ১১১টি গোল্ড রেটেড। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি গ্রিন কারখানার মধ্যে ৮টি বাংলাদেশে অবস্থিত। ২০২২ সালে আমাদের ৩০টি কারখানা গ্রিন হয়েছে। কোন একক বছরে এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রিন কারখানার সংখ্যা। পোশাক শিল্প আজ নিরাপদ কর্মপরিবেশের রোল মডেল।

সম্প্রতি বিজিএমইএ এর সাসটেইনেবিলিটি স্ট্র্যাটেজিক ভিশন-২০৩০ ঘোষণা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পের প্রবৃদ্ধি এমনভাবে অর্জন করা, যা একাধারে টেকসই হবে এবং গ্রহ ও মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। এ রূপকল্প অনুযায়ী আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক শিল্পে ১০০% জেন্ডার সমতা অর্জন এবং ১০০% নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও শোভন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিগত এক দশকে উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সরকার, ব্র্যান্ড/ক্রেতা, উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট অংশীদার সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে তৈরি পোশাকখাতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, টেকসই উন্নয়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন হয়েছে, আগামী দিনগুলোতে তা অব্যাহত রাখতে পোশাক শিল্প দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

উৎপাদনের প্রবহমান ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পোশাক শিল্প নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

আমি আশাকরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৩ উদযাপনে সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ফারুক হাসান

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

মহান স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল, কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা যেমন ছিলেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার তেমনি তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নের চাবিকাঠি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের শ্রমিক সমাজের অবদান অপরিসীম। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে। বর্তমান বাজারদরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রমিক কর্মচারী ও মেহেনতি মানুষের জীবনধারণ উপযোগী বেতন, মজুরী, ভাতা, বোনাস, চাকরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বীমা, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, দুর্ঘটনায় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, গ্রাচুইটি ইত্যাদি যথাযথভাবে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগ আপোষহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকের জীবনমান ও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজশাহীতে পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি প্রশিক্ষণ ও রিসার্স ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার ডায়নামিক লিডারশিপে ২৮ এপ্রিল ২০১৬ সাল হতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা শ্রমজীবীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের।

শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতন করতে এবং দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আপোষহীন থেকে সরকার-মালিক-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে গঠনমূলক, দায়িত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু-জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

নূর কুতুব আলম মান্নান

সম্পাদকীয়

‘নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ’- প্রতিপাদ্য নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এ বছর অষ্টমবারের মতো পালিত হচ্ছে ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩’। প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল সারা বিশ্বে পালিত হয় ‘World Day for Safety and Health at Work’, যা আমাদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আরও সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেয়। শ্রমিক, মালিক ও সরকার সবাই কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটিই হলো এ দিবসের মূল চেতনা।

আমাদের জাতীয় জীবনে এ দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ভিশন-২০৪১ অর্জনে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। দেশের অর্থনীতিতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। তাই এসব শিল্পের কর্মপরিবেশ সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ রাখার কোন বিকল্প নেই।

জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাস এবং টেকসই উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ নির্ধারিত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ অর্জন তথা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই।

মালিক, শ্রমিকসহ শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে দিবসটিতে আমরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক স্মরণিকা প্রকাশ করছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ গুণীজনের বাণী, নির্দেশনা ও লেখা এ স্মরণিকায় স্থান পেয়েছে যা বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় পাথেয় হয়ে থাকবে। এই স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্মরণিকায় মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত অন্যান্য ভুল (যদি থাকে) সবাইকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। সবাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতন হোক; কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এই হোক এ দিবসের অঙ্গীকার।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদক
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহযোগী
সাবিহা মুক্তা, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ কোরবান আলী, গ্রন্থাগারিক, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশনা
প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০২৩

ডিজাইন ও প্রিন্ট
শৈলী প্রিন্টার্স, ০১৭৩৩২৪১৮২৬

সূচিপত্র

ক্রমিক নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	**নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ** মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৪১
০২	**কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং সেইফটি বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকের করণীয়** আরদাশীর কবির, সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	৪৪
০৩	**Occupational Diseases** Prof Dr Sk Akhtar Ahmad, Professor of Occupational & Environmental Health, BUHS	৪৬
০৪	**চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার নতুন বাস্তবতা** এ,কে,এম, সেলিম ওসমান, এমপি, সভাপতি, বিকেএমইএ	৫২
০৫	**Smart production is good for business and the working environment** Ole Justesen, Sector Counsellor, Royal Danish Embassy, Bangladesh.	৫৫
০৬	**তৈরি পোশাক শিল্প, শোভন কর্মপরিবেশের পথিকৃৎ** ফারুক হাসান, সভাপতি, বিজিএমইএ	৫৭
০৭	**OSH at the Enterprise level:Progress and Priorities** Mohamad Anis Agung Nugroho & Sikder Mohammad Tawhidul Hasan, ILO Better Work, Bangladesh	৫৯
০৮	**পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ: ফায়ার সেফটি** ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৬৩
০৯	**Improving Safety Culture through the Introduction of an Employment Injury Insurance** Syed Moazzem Hussain, Senior Technical Advisor, GIZ	৬৬
১০	**শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সময়ের চাহিদা** ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র	৬৯
১১	**Ensuring Worker's Safety and Security: The Role of Enterprise Clinics** Mosrat Jahan, M&E Officer, EIS Project.ILO Country Office for Bangladesh.	৭১
১২	**বাংলাদেশে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি: সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) যা ভাবছে** সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)	৭৪
১৩	**ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস প্লান** প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান পি. ইঞ্জ, সদস্য, জাতীয় অস (অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেল্থ) কমিটি	৭৮
১৪	**আলোকচিত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম**	৮৩

“নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ”

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বিশ্বব্যাপী ‘World day for safety and health at work’ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য হলো ‘A safe and healthy working environment, a fundamental right.’ আইএলও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশকে মৌলিক অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বাংলাদেশে শ্রমিকের শোভন কর্মপরিবেশের অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিবসটির উদ্দেশ্য সারাদেশে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে নিয়মিত অভ্যাস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই দিবসে নানা প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো ‘নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ’। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে ‘স্মার্ট ইকনমি’ নিশ্চিত করতে হবে। আর স্মার্ট ইকনমি গড়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল কর্মক্ষেত্রে শোভন পরিবেশ নিশ্চিত করা। দেশের শ্রমখাতকে স্থিতিশীল, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ ও বিনিয়োগবান্ধব রাখার মাধ্যমেই দেশ উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী দেশের কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মালিক, শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থার মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত, তাৎক্ষণিক ও বিশেষ পরিদর্শনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ দেশের শ্রমখাতকে স্থিতিশীল রাখার সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ স্বাস্থ্যসম্মত, টেকসই ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের নিয়মিত ও বিশেষ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

শ্রম পরিদর্শন:

কারখানা, দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লক্ষ্য। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ কর্তৃক মোট ৪৩,৬৪৪টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন:

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,৫৬৮টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩৬,৭৮৬টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে। লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন ফিসহ অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত ৫,৯৭,২৬,৫৬৬ টাকা রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ:

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাইফের তত্ত্বাবধানে প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১২,৬৬৪ জন নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৪৭,১০,৬৬,১৪৫ টাকা।

সেইফটি কমিটি গঠন:

কলকারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য কারখানায় মোট ৬৪৯৭টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট যোগ্য কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ:

কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ডাইফের পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানার মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩,১৭,৪৮,০০০ টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার লঙ্ঘন বিষয়ে সরাসরি এবং হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এর মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শ্রম বিষয়ক মোট ৩৬০৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

গণশুনানি নিষ্পত্তি:

শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইন ও বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিক ও মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে নিয়মিত গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭৯৮ টি আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৯২৭ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসন:

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের মুক্ত করার নিমিত্ত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি, ট্যানারি, কাঁচ, সিরামিক, জাহাজ রিসাইক্লিং, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা, রেশম খাত থেকে শতভাগ শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক 'আইএলও কনভেনশন-১৩৮' অনুসমর্থন করেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

শিশুকক্ষ স্থাপন:

নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে নারীবান্ধব

কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মোট ৫১৫টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে শিশুকক্ষ স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক ৪৩১টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মামলা:

কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করার পর তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৪২৬ টি।

কারখানা সংস্কার কার্যক্রম:

ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ তদারকির জন্য অধিদপ্তরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেইফটি ইউনিট এর তত্ত্বাবধানে কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর যৌথ উদ্যোগে সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:

শ্রমিক, মালিক, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSTRI)'-এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শ্রমিক দুর্ঘটনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে এটিই প্রথম বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান।

শ্রম পরিদর্শন ডিজিটালাইজেশন:

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এজন্য 'লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন' (লিমা) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম লিমার মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি:

জাতীয় উৎসব ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সারাদেশে পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ও ছুটি নিশ্চিতকরণসহ সকল প্রকার শ্রম অসন্তোষ নিরসনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটিসমূহ নিরলসভাবে কাজ করছে। শ্রমখাতে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকগণ তা নিরসনের চেষ্টা করেন। উৎসবের পূর্বে কোনো শ্রমিকের ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধ রোধকরণেও কমিটিগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

সমন্বিত পরিদর্শন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুশাসনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নেতৃত্বে এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে ১০৮টি সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিম কর্তৃক ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি শিল্প-কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনাপূর্বক পরবর্তী সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিডার নেতৃত্বে ২য় পর্যায়ে আরও পাঁচ হাজার শিল্প-কলকারখানা পরিদর্শনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সামগ্রিক এই পরিদর্শন কার্যক্রমে সরকারি অন্যান্য দপ্তরসমূহ ও পরিদর্শকগণের মাঝে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে ডাইফ।

পরিশেষে বলা যায়, কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে মালিক, শ্রমিক, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আন্তরিক হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার অনুশীলন করতে হবে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে উঠবে স্মার্ট ইকনমি। এর মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং সেইফটি বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকের করণীয়

আরদাশীর কবির
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে শিল্পখাতে আমাদের অবশ্যই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির পাশাপাশি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে মালিকরা সবসময়ই আন্তরিক, যাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগও নিরাপদ থাকে। সেই সাথে শ্রমিকরাও মালিকদের কাজে বরাবরই সহযোগিতা করে থাকে। আমরা জানি যে, শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রমিক শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেই তার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং কাজের ক্ষেত্রে তার মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হবে। সেই সাথে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে আমরা আমাদের গুণগতমানসম্পন্ন পণ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুসংহত করতে একধাপ এগিয়ে যাবো। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং এই বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকের করণীয় তথা দায়িত্ব সম্পর্কে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) ০২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে একটি প্রতিবেদন (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে) প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয় ২০২২ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে ১,০৩৪ জন শ্রমিক ও আহত হয়েছে ১,০৩৭ জন শ্রমিক। প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে, যেমন: পরিবহণ খাতে ৪৯৯ জন (সর্বোচ্চ, ৪৮%), নির্মাণ খাতে ১১৮ জন, কৃষি খাতে ১১২ জন, দিনমজুর ৪৬ জন, কন্টেইনার ডিপোতে ৪৪ জন, বিদ্যুৎ খাতে ২২ জন, জাহাজ শিল্পে ১৫ জন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ খাতে ১২ জন এবং ইটভাটায় ১০ জন । সুতরাং কর্মক্ষেত্রে সেইফটি ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তাই শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই কর্মক্ষেত্রে সেইফটি নিশ্চিতকরণে একত্রে কাজ করে যেতে হবে।

এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে সেইফটি নিশ্চিত করতে পারলে নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন:

- কোম্পানির খরচ কমবে।
- বীমা খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে।
- শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান/কারখানার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাবে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও অংশীজনদের মধ্যে ভালো ধারণা দেবে।
- বিভিন্ন ধরনের আইনী জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
- শ্রমিকদের কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।
- শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।
- একই ধরনের অন্যান্য কোম্পানির জন্য উদাহরণ হতে পারে।
- বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার বাজারে ভালো অবস্থান তৈরিতে সহায়ক হতে পারে।

- শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।

সেইফটি বিষয়ে মালিকের করণীয়

সেইফটি বিষয়ে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই দায়িত্ব যদি উভয়ের জায়গা থেকে পালন করে তাহলে কর্মক্ষেত্র নিরাপদ থাকে। মালিকের দায়িত্বগুলো নিম্নে তুলে ধরছি, যদিও এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-

- প্রতিষ্ঠান/কারখানা তৈরির সময় বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুসরণ করা।
- প্রতিষ্ঠান/কারখানার ধরন অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা এবং তা শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা।
- প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা।
- কর্মক্ষেত্রে কোনো আপদ (Hazard) থাকলে তা চিহ্নিত ও অপসারণ করা।
- শ্রমিকদের জন্য মাঝেমধ্যে সেইফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যাতে তাদের সেইফটি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকে।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান/কারখানায় জরিপ চালানো।
- জরিপে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে জরুরিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- কর্মক্ষেত্রে বা এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেইফটি বিষয়ক উত্তম চর্চা বাস্তবায়ন করা।
- শ্রমিকদের মানসিক চাপ যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে তাদেরকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শ্রমিকদের বিশ্রাম ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ তৈরি করা।
- কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক থাকলে সেইফটি কমিটি গঠন করা ও সেটিকে সক্রিয় রাখা।
- প্রতিষ্ঠান/কারখানায় ৩০০ শ্রমিক কর্মরত থাকলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সেইফটি কর্মকর্তা নিয়োগ করা।
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিষয়ে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে প্রেরণ করা।
- পেশাগত রোগ বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত শ্রমিকদের মালিকের খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।
- প্রতিষ্ঠানে ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলে গ্রুপ বীমা চালু করা।
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম ও মৃত ব্যক্তিদের আইন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা।
- কতিপয় ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পঁচিশ বা তার বেশি শ্রমিক থাকলে সেইফটি রেকর্ডবুক রাখা।
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ৫,০০০ বা তার বেশি শ্রমিক থাকলে কারখানায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রাখা।

সেইফটি বিষয়ে শ্রমিকদের করণীয়

কর্মক্ষেত্রে সেইফটি নিশ্চিত করতে মালিকের ন্যায় শ্রমিকেরও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো, যদিও এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-

- সেইফটি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান/কারখানার গাইডলাইনসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- কোনো মেশিন বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কাজ করার সময় সেই বিষয়ে সকল নির্দেশনা মেনে চলা।
- সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করা।
- প্রতিষ্ঠান/কারখানার কোনো জায়গায় অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দ্রুততার সাথে অবহিত করা।
- প্রতিষ্ঠান/কারখানায় সেইফটি বিষয়ক কোনো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হলে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।
- কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে গুজব সৃষ্টি না করা।
- কর্মক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে নারী ও প্রতিবন্ধী সহকর্মীদের নিরাপদ প্রস্থানে সহায়তা করা। কোনোভাবেই হুড়োহুড়ি না করা।
- কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে নির্ধারিত স্থানে সকলে একত্রিত হওয়া। গণনা শেষ না হওয়া অবধি স্থান ত্যাগ না করা।
- দুর্ঘটনা ঘটলে তদন্ত কাজে সঠিক তথ্য দিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সহায়তা করা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্মক্ষেত্রে সেইফটি যেমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তেমনি এই সেইফটি নিশ্চিত করতে শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষের অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। আর সরকার তথা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন অধিদপ্তর শ্রমিক ও মালিকের সেই কাজগুলোকে নিয়মিতভাবে তদারক ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই কর্মক্ষেত্রে সেইফটি নিশ্চিতকরণে সরকার, মালিক, শ্রমিক ও অন্যান্য অংশীজনকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে। আসুন আমরা সকলেই আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হই।

Occupational Diseases

Prof Dr Sk Akhtar Ahmad
Professor of Occupational & Environmental Health
Bangladesh University of Health Sciences (BUHS)
Mirpur-1, Dhaka-1216

Introduction

Occupational disease is a huge economic burden as well as a public health burden worldwide. According to the ILO, occupational diseases and accidents cost the world 4% of its GDP (approximately US$ 2800 billion) each year. Every year, 2.3 million workers die due to occupational diseases and injuries, of which 2 million deaths are due to fatal occupational diseases. And every day, occupational diseases and injuries cause 6400 deaths among the workers. Further, it is estimated that about 160 million non-fatal occupational diseases occur each year. It has been revealed that deaths due to occupational diseases contribute to more losses than occupational accidents, which are approximately six times higher (Figure 1). The loss not only involves an economic burden but also causes a big loss of manpower. As a result of the loss of manpower especially skilled and experienced workers, both the quantitative and qualitative performance

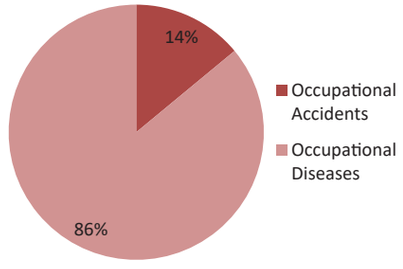

Figure-1 Global Occupational Fatal Diseases and Accidents in a yearr

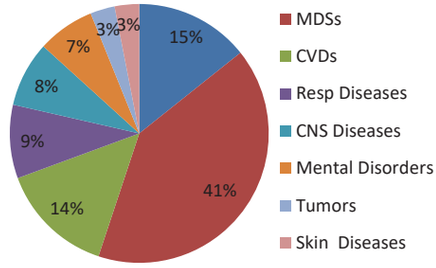

Figure -2 Global Occupational Diseases and Accidents in a year

Source: ILO [1]

of the work decreases. However, it is not possible to quantify the suffering that the accidents and illnesses cause for workers and their families. Thus, occupational diseases and injuries cause not only economic loss but also suffering in family and community and lead to a scarcity of skilled manpower. In terms of cost, it was found in a global estimate that accidents contributed only 14% of total compensation costs, with the remainder contributed by occupational and work-related diseases. Among these, the most common diseases were musculoskeletal disorders (40%), cardiovascular diseases (16%), respiratory diseases (9%) and nervous system diseases (8%) (Figure-2). The burden of occupational diseases is greater in low and middle-income countries, where health and safety laws are often not well implemented. [1-3]

What is Occupational disease?

Occupational skin cancer (scrotal cancer) among chimney sweepers was the first identified occupational disease in the world during the Industrial Revolution in 1775. [4] The detection of occupational diseases is a complex task. Some occupational diseases are very specific because their causative factors are present in the workplace, but the majority of these diseases require a long latency period. On the other hand, some diseases have multiple causal or influencing factors, or some diseases may be related to occupation or working conditions in some way and thus be classified as occupational diseases. As a result, the definition of occupational disease is not uniform; it differs from country to country based on their own context and situation, particularly as specified in their laws and regulations. However, occupational disease is defined as "any disease contracted as a result of an exposure to risk factors arising from work activity" in the ILO Convention No. 155 of 1981 and the ILO Code of Practice 1996. The European Union defines occupational disease as "a case recognized by the national authorities responsible for recognition of occupational diseases'. According to the Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS), occupational disease is a health condition or disorder (e.g., cancer, musculoskeletal disorders, post-traumatic stress disorder, etc.) caused by the work environment or work-related activities. Furthermore, CCOHS stated that "in general, health conditions or disorders that occur at a higher frequency than the rest of the population among a group of people with similar occupational exposures are considered to be occupational diseases." 'WorkSafeBC' of Britsh Columbia states that occupational diseases are conditions or disorders that result from the nature of work. [4-9] However, many other definitions of occupational diseases have been provided by various countries and organizations. In Bangladesh, according to BLA 2006, in Chapter-XII (Workmen's Compensation) Section-150, sub-section 3(b) regarding occupational disease, it is stated that .....in any employment specified in Part B of the Third Schedule (list of occupational diseases for compensation), if an employee contracts any disease specified therein as an occupational disease peculiar to that employment, the contracting of the disease shall be deemed to be an injury by accident within the meaning of this section, and, unless the employer proves the contrary, the accident shall be deemed to have arisen out of and in the course of the employment. Section 62 of the BLA 2006 states that any diseases listed in the second schedule (a list of notifiable diseases but not occupational diseases) of the law should be reported to the authority if contracted. However, there is no clear legal definition of an occupational disease in Bangladesh. Legal definition of occupational diseases should be set out in Bangladesh. [10-11]

Work-related disease

Occupational disease and work-related disease are typically viewed differently, particularly in terms of compensation. The third edition of the International Labour Organization's Encyclopedia of Occupational Health and Safety made the following distinction: diseases caused by occupation are occupational diseases, while diseases aggravated by work or having a higher incidence due to working conditions are work-related diseases. It is obvious that there is a causal relationship between occupational exposure and specific diseases in occupational disease, whereas work-related diseases are those diseases that can be caused, worsened, or jointly caused by working conditions. [6,12] However, the common accepted criteria for recognizing occupational diseases are

- occupational disease with a specific or strong link to occupation, usually with a single causal agent.
- occupational disease occurs as a result of a specific work environment and occupation; and
- occupational disease occurs among the groups of persons concerned with a frequency which exceeds the average morbidity of the rest of the population.

Work-related diseases, on the other hand, are defined by the following criteria:

- work-related diseases are those with multiple causal agents, in which factors in the work environment, along with other risk factors, may play a role in the development of such diseases.
- diseases affecting working populations that have no causal relationship with work but may be exacerbated by occupational health hazards. [6,12-14]

However, in some countries work-related diseases are treated the same as work-caused diseases, which are in fact occupational diseases. The concepts of work-related diseases and occupational diseases have always been a matter of discussion.[13,15]

List of Occupational Diseases

The list of occupational diseases in a country is required to legally recognize the occupational disease and provide compensation to workers who suffered from the specific disease, as well as injury benefits. It is also required for reporting and the implementation of preventive measures. In the legal system, there should be a national list of occupational diseases for compensation. Since its inception in 1919, the ILO has listed two occupational diseases: anthrax and lead poisoning. ILO initiated the creation of a list of occupational diseases in order to provide compensation to workers. Because of emerging occupational diseases, modernization and new technology, structural development, and changing conditions, the list of occupational diseases is revised and modified on a regular basis. The ILO revises the lists as needed. However, in 1925, the ILO Convention 18 (C-18) added mercury poisoning to the previous list of occupational diseases covered by workers' compensation. After a few years, in 1934 (C-42) added seven more diseases to the list of occupational diseases. This list of ten occupational diseases was maintained until 1964, when it was expanded to fifteen occupational diseases by ILO Recommendation No. 121 (R-121). In 1980, C-121 amended the Employment of Injuries Benefits Recommendation of 1964 (R-121) to review and increase the list of occupational diseases to twenty-nine. In 2002, however, the list of occupational diseases was revised in R-194 to emphasize disease prevention and reporting rather than compensation. The revision was done in a new format by dividing the list into four categories which are as follows:

1) Diseases caused by agents (chemical, physical, biological)
2) Diseases of target organ systems (respiratory, skin, musculoskeletal)
3) Occupational cancer
4) Other diseases

The latest revision of the list of occupational diseases was done in March 2010 by ILO, which was approved at the 307th session of the ILO Governing Body meetings. This latest list also categorized the diseases in ways similar to the 2002 list. However, in the latest list, the mental or behavioral disorders were added newly in the second category diseases of target organ systems (respiratory, skin, musculoskeletal and mental or behavioral disorders) of 2002 list. This list of occupational diseases was created to help countries with the prevention, recording, notification, and compensation of occupational diseases. The latest list of occupational disease contains a total of 106 diseases. [4,15-19]

In Bangladesh, the BLA 2006 contains two types of occupational disease lists. One list of diseases contains 30 diseases, and if any of them occur, the authority (DIFE) should be notified. The diseases on this list are not classified as occupational diseases. However, another list contains 33 diseases that are classified as occupational diseases, and this list is for compensation. None of these lists however, included the definition and diagnostic criteria for an occupational disease.[10,11]

Occupational diseases in Bangladesh

So far in Bangladesh no occupational diseases have been reported to the authority neither for

notification nor for compensation. However, epidemiological studies conducted by various organizations and institutes, including BILS, NIPSOM and BUHS, in various industries and occupations revealed the prevalence of a number of occupational diseases specific to a particular industry or occupation. Some of these studies, however, were weak in terms of design and sample size, but the identified occupational diseases made it evident that the sources of disease were the particular industry or occupation. Therefore, it indicated that people working in various occupations suffered from occupational diseases that were not legally reported. In the BLA 2006, chemical toxicity (poisoning) accounts for the majority of occupational diseases under compensation (33) and occupational notifiable diseases (30). However, the majority of the diseases identified in the studies had not been proven to be associated with chemical toxicity. Because identifying or confirming chemical toxicity requires evidence of exposure to that specific chemical during work, which is not always possible. Because testing blood or human tissues for that specific chemical or metabolite is costly and sometimes unavailable in Bangladesh. The following are some occupational / work-related diseases found in various studies in Bangladesh (not conclusive). [11,20,21]

- **Garment industry:** musculoskeletal diseases (MSDs), urinary tract infections, respiratory diseases, noise induced deafness, eye strain, headache, depression, fatigue
- **Cotton/textile industry:** byssinosis, other respiratory diseases, MSDs, dermatitis, noise induced deafness, hypertension
- **Jute industry:** chronic obstructive pulmonary disease (COPD), other respiratory diseases, MSDs, dermatitis
- **Tannery industry:** chrome ulcers, other dermatitis, respiratory diseases, MSDs, gastro- intestinal diseases, headache, hypertension
- **Lead Acid Battery Industry:** lead toxicity including tingling and numbness, tremors, colic pain, frequent headaches, anaemia, hypertension,
- **Tobacco industry:** respiratory diseases, dental diseases, anosmia
- **Steel and engineering industry:** noise-induced deafness, heat exhaustion, prickly heat, respiratory diseases, MSDs, low vision, other eye diseases
- **Ceramic industry:** silicosis, other respiratory diseases, prickly heat, dermatitis, anaemia
- **Glass industry:** respiratory problems, skin itching, dimness of vision (cataract), prickly heat
- **Shipbreaking Industry:** asbestosis, other respiratory diseases, dermatitis, MSDs, blurring of vision, lacrimation, itching.
- **Stone crushing industry:** COPD, other respiratory diseases, eye diseases
- **Handloom industry:** noise induced deafness, MSDs, dermatitis
- **Rice mill:** respiratory diseases, MSDs, eye diseases
- **Saw mill:** respiratory diseases, conjunctivitis, other eye diseases, MDSs, dermatitis, `
- **Shrimp and other fish processing industry:** dermatitis (fungal infection), respiratory diseases, urinary tract infection, MSDs, gastro-intestinal diseases
- **Construction:** respiratory diseases, MSDs, dermatitis, visual problem, deafness
- **Agriculture:** pesticide toxicity, MSDs, weakness, muscle fasciculation, paraesthesia, nystagmus, headache, dermatitis, anthrax, helminthiasis, respiratory diseases, heat stroke.

Several studies have reported the aforementioned diseases, indicating the presence of occupational diseases in a variety of industries in Bangladesh. Among these, the common diseases were respiratory diseases (asthma, bronchitis, chronic cough) MSDs (back pain, shoulder pain, neck pain and other joint pain), dermatitis (inflammation, itching, rash), eye diseases (conjunctivitis, itching, pain), urinary tract infection, noise induced deafness and headache However, none of the diseases were legally reported.

The following are possible reasons for not reporting occupational diseases in Bangladesh:

1) Lack of awareness among concerned personnel and service providers regarding the list of occupational diseases as well as the provision for compensation in labour law.
2) The BLA 2006 lacks identification criteria and protocol for diagnosing occupational diseases.
3) There are no provisions for occupational disease surveillance.
4) Inadequate and expensive facilities for testing blood and other human tissues especially to confirm chemical exposure and to diagnose chemical toxicity.
5) The lack of TLV/MPL in the law makes it difficult to establish exposure.
6) There is a lack of permissible standards for work environment factors, manufacturing processes, machineries, and toxic substances, as well as levels or concentrations of substances in the air.
7) There is lack of skilled/trained personnel for detecting and reporting occupational diseases.
8) Training and education facilities for occupational diseases are inadequate and limited.
9) There are no special healthcare facilities for occupational diseases within the national health care system.
10) Research on occupational diseases should be promoted and encouraged, with more facilities and supports.
11) The list of occupational diseases in BLA 2006 should be updated based on studies and reports from a variety of industries, and diagnostic criteria for the diseases should be added.
12) There should be a regular reporting system for occupational diseases established for industries, as well as a proper record-keeping system (digital data management), data analysis and documentation.

References

1. ILO. Global Trends on Occupational Accidents and Diseases. International Labour Organization 2015. https://www.ilo.org/legacy/english/osh/en/storycontent/ external_ files/ fs_st_1-ILO_5_en.pdf.
2. ILO. World Statistic. The enormous burden of poor working conditions. https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/ WCMS _249278/lang--en/index.htm
3. Ponsonby W. Global occupational health. Occupational Medicine 2017; 67(5): 331–333 doi:10.1093/occmed/kqx068
4. Kim EA and Kang SK. Historical review of the List of Occupational Diseases recommended by the International Labour organization (ILO). Annals of Occupational and Environmental Medicine 2013, 25:14. http://www.aoemj. com/content/25/1/14
5. ILO. Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases, International Labour Conference, 90th Session 2002, Report V(1), International Labour Organization, 2002, https://www.ilo.org/public/english/ standards/ relm/ ilc/ilc90/pdf/rep-v-2a.pdf
6. European Commission. Report on the current situation in relation to occupational diseases' systems in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC. https://ec.europa.eu/ social /BlobServlet? docId=9982&langId=en
7. CCOHS. Occupational Hygiene - Occupational Disease: OSH Answers. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. https://www.ccohs.ca/oshanswers/ hsprograms/occ_ hygiene/occ_disease.html
8. Foulis M. 7 most common occupational diseases. Canadian Occupational Safety News Letter, October,2022. https://www.thesafetymag.com/ca/topics/occupational-hygiene/7-most-common -occupational-diseases/236947

9. WorkSafeBC. Occupational Diseases. https://www.worksafebc.com/en/claims/report-workplace-injury-illness/types-of-claims/occupational-diseases.
10. BLA-2006. Bangladesh Labour Act, 2006. https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ ELECTRONIC/76402/110637/F-1265526237/BGD76402%20Eng.pdf.
11. BILS. Occupational Safety and Health In Bangladesh: National Profile 2015. http://bilsbd.org/wp-content/uploads/2016/03/BILS-ILO-Study_OSH-Profile_Final-Report29-June-2015.pdf
12. Michel L. Work-related Diseases and Occupational Diseases: The ILO International List. https://www.iloencyclopaedia.org/part-iii-48230/topics-in-workers-compensation-systems/item/355-work-related-diseases-and-occupational -diseases-the-ilo-international-list
13. Tjalvin G. Differences between Work-Related and Occupational Diseases. Future Learn. https://www.futurelearn.com/info/courses/occupational-health-developing-countries/0/ steps/13078.
14. ILO. Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases – Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases. International Labour Organization 2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/ documents/publication/wcms_836362.pdf.
15. Driscoll T, Wagstaffe M and Pearce N. Developing a List of Compensable Occupational Diseases: Principles and Issues. The Open Occupational Health & Safety J 2011; 3:65-72.
16. Niu S. The ILO Activities on Occupational Diseases. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11290&langId=enhttps://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11290&langId=enhttps://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11290&langId=e
17. ILO. R194 List of Occupational Diseases Recommendation. International Labour organization.https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100: P12100 _INSTRUMENT _ID:312532.
18. ILO. C121 - Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121). International Labour organization. https://www.ilo.org/global/ standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
19. ILO. List of Occupational diseases, 2010. International Labour Organization. https://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_125137/lang--en/index.htm
20. DIFE. National Profile on Occupational Safety and Health in Bangladesh 2019. Department of Inspection for Factories and Establishments, 2021.
21. Ahmad SA and Khan MH. Compendium on Occupational Health and Safety, Department of Occupational and Environmental Health, NIPSOM, Mohakhali, Dhaka-1212 (unpublished)

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার নতুন বাস্তবতা

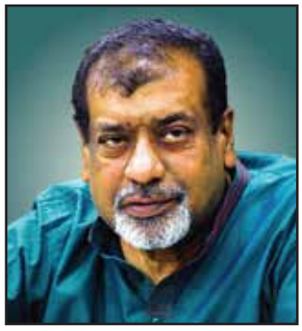

এ,কে,এম, সেলিম ওসমান, এমপি
সভাপতি
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

ডিজিটালাইজেশনের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, একটু চোখ বুঁজে ফ্ল্যাশব্যাকে আমাদের যাপিত জীবন, কাজ আর সামাজিক জীবনের পরিবর্তনকে অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবো ধীরে ধীরে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজকর্ম থেকে শুরু করে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা সবকিছুই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে সহজ থেকে সহজতর হয়ে গেছে। ক্লাউস শোয়াব ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম এর গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ ইনসাইট রিপোর্ট (The Future of Jobs-Employment, Skills and Work-force Strategy for the Fourth Industrial Revolution in 2016)- এ অদূর ভবিষ্যতে একটি নতুন শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যা মানুষের কাজ করার পদ্ধতি, ভোক্তার আচরণ, এমনকি তাদের চিন্তার পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করবে।

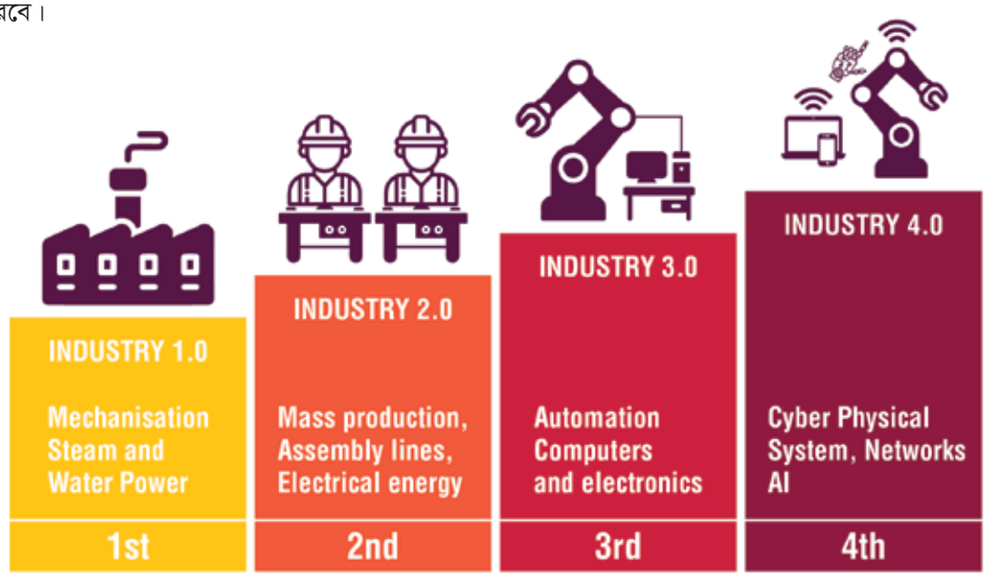

প্রথম শিল্প বিপ্লবের সময়ে আমরা দেখেছি, বাষ্প ইঞ্জিনের উদ্ভাবন মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে সহজ ও গতিশীল করেছে। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কারের মাধ্যমে আধুনিক মানব সভ্যতার সূচনা করেছে। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের যুগে অটোমেশনের সূচনা করেছে ইন্টারনেটের উন্মুক্ত তথ্যবাতায়ন। আর এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উৎকর্ষে ভার্চুয়াল জগতের জানালা উন্মোচিত হয়েছে। ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেম, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক সুপার ইন্টেলিজেন্স বিপ্লব মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে। কোন সন্দেহ নেই যে, প্রযুক্তি আর যন্ত্রের প্রভাবে শ্রমবাজার ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবে। কিছু কিছু নতুন কর্মসংস্থান যেমন সৃষ্টি হবে আবার কিছু কিছু কাজ বিলুপ্তও হবে।

সভ্যতার এই উত্তরণে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় কাঠামোগতভাবে একটি জটিল রূপান্তর প্রক্রিয়া সংঘটিত হবে। পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, কাজের বৈচিত্র্য, ধরন, দক্ষতা, অনিশ্চয়তা, টিম সমন্বয়, ওভারটাইম, রাশ অর্ডার, যোগাযোগ, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা, সমস্যার সমাধান, উন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, কাজের নিরাপত্তা

সবকিছুই আসলে একই মিথস্ক্রিয়ার অংশ। প্রত্যেকটি বিষয় একে অপরকে প্রভাবিত করছে, একটি আরেকটির অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। এই বিশাল কর্মজগতের কোন একটি অংশে প্রযুক্তায়নের প্রভাব সমগ্র সিস্টেমটিতে অভিযোজিত হবে।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার যথার্থ প্রয়োগ এবং ব্যবহার নিশ্চিতভাবে আমাদের কারিগরী উৎপাদনশীলতার বক্ররেখাকে ঊর্ধ্বমুখী করবে। তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে আলোকপাত করতে হবে। মনোসামাজিক ঝুঁকি এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। বিজনেস ভ্যালু চেইনে স্মার্ট অটোমেশন এবং নতুন প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকরণের আগে আমাদের নিজস্ব প্রস্তুতি ও প্রতিবন্ধকতাগুলোকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কর্মীদের অপর্যাপ্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব উৎপাদনব্যবস্থাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে।

আমাদের নিট শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা মূলত সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। উৎপাদন শ্রমিকের সিংহভাগই নারী, যাদের বেশিরভাগই অশিক্ষিত এবং প্রযুক্তির সম্পর্কে অজ্ঞ। সাম্প্রতিক GIZ এবং ETI এর একটি যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের ৫৩.৬৫% নারী শ্রমিক এবং এদের মধ্যে সর্বোচ্চ (৫৯.৬৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাশ। বিদ্যমান এই বিপুল শ্রমগোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ করে না তুলতে পারলে কর্মসংস্থানের উপর একটি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হবে। অটোমেশন আত্মীকরণের সাথে সাথে তাদের মধ্যে একটি মনোসামাজিক চাপ তৈরি হবে যা সমগ্র কর্মপরিবেশের উপর প্রভাব ফেলবে। শ্রমিকদের কম্পিউটার দক্ষতা এবং কর্মসম্পর্কিত দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপের কোন বিকল্প নেই। এই ধরনের দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া বয়স্ক শ্রমিকদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে, কারণ নতুন প্রযুক্তিকে আলিঙ্গনের ক্ষেত্রে বয়স একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। উন্মুক্ত মন নিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে না পারলে কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা থেকে হারিয়ে যাবার ভয় তাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল এবং অবসন্ন করে ফেলবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে আমাদের প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা একীকরণের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান মানবসম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে কারণে হয়ত অপারেশনাল ম্যানেজমেন্টে কৌশলগত পরিকল্পনায় কিছু নীতিগত সংযোজন-বিয়োজন ঘটবে। বিশিষ্ট আমেরিকান কলামিস্ট ফ্রিডম্যানের মতে, বিশ্বায়নের এই যুগে 'The World is Flat'- এই অর্থে যে, শিল্প এবং উদীয়মান বাজারগুলোর মধ্যে এর মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হচ্ছে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক বাজারগুলো একই সরবরাহ চেইনের অংশ হয়ে ওঠা তারই একটি উদাহরণ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বায়ন ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বায়ন কাজের সময়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। নিজেকে গ্লোবাল কর্মী হিসেবে উপস্থাপন করতে গেলে আঞ্চলিক সময় এবং বৈশ্বিক সময়ের ঘড়ির কাটায় সমন্বয় করতে হবে যা আদতে মানুষের বায়োলজিক্যাল চক্রকে ব্যাহত করে। শিফটিং কর্মপ্রক্রিয়ায় একজন মানুষের জৈবিক সময় এবং সামাজিক সময়ের উপর ভিত্তি করে তার শ্রমসময় নির্ধারিত হয়। বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগের এই প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলে কর্মীর জৈবিক সময় এবং কাজের সময়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে যার নেতিবাচক প্রভাবও ব্যাপক।

গবেষণার তথ্যমতে যারা শিফটিং ব্যবস্থাপনায় কাজ করে বিশেষ করে রাতের পালায় তাদের মধ্যে নিদ্রাহীনতা, হজমশক্তি হ্রাস, ইমিউনিটি হ্রাস, ওজন বৃদ্ধি, মুড সুইং, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এছাড়ায় দীর্ঘমেয়াদী রোগের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, ডায়বেটিসসহ ক্যান্সারের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে তার প্রজনন স্বাস্থ্যের উপরও হুমকিস্বরূপ। এছাড়াও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও যান্ত্রিকীকরণের ফলে অপারেশনে নিয়োজিত কর্মীদের নিরাপত্তা ঝুঁকিকেও বিবেচনা করতে হবে। নতুন ধরনের মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

যুগের সাথে একই গতিতে চলতে হলে প্রযুক্তির এই আগ্রাসনকে যেমন অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই একইভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার মূল উপাদান কর্মী এবং তাদের অধিকার ও চাহিদাকেও অবহেলা করার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে সরবরাহ চেইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি স্টেকহোল্ডারেরই সচেতন ভূমিকা থাকতে হবে।

চিত্র-০১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি এর সাথে বিকেএমইএ'র সভাপতি এ,কে,এম সেলিম ওসমান, এমপি

বিকেএমইএ মালিক পক্ষের সংগঠন হলেও শ্রমিকের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্বারোপ করে। সকলের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সুস্থ গ্রহে জীবনযাপনের সুযোগ নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘের নির্ধারিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পাবলিক-প্রাইভেট সেক্টরকে পরস্পর সহযোগী হয়ে কাজ করতে হবে। বিকেএমইএ নিটওয়্যার সেক্টরের কল্যাণে যেকোন উন্নয়ন কর্মসূচি নকশার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তার সূচকগুলোকে বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা করে। লক্ষ্যমাত্রা ৩ ও ৮ সরাসরি

শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার নিশ্চয়তাকে নির্দেশ করে। এপর্যন্ত আমরা কারখানায় কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি।

বিশ্বব্যাপী কমপ্লায়েন্স এর মানদণ্ডে বাংলাদেশের তৈরি নিট পোশাক শিল্প একটি শক্তিশালী টেকসই অবস্থান অর্জন করেছে। বিল্ডিং স্ট্রাকচারাল কমপ্লায়েন্স, ফায়ার সেইফটিসহ শ্রমিকের মৌলিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতে আমরা এখন বিশ্বের কাছে উদাহরণস্বরূপ। বিশ্বের তৈরি পোশাক রপ্তানীকারক দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবেশবান্ধব কারখানার অবস্থান বাংলাদেশে। লীড তালিকার শীর্ষ ১০০টি কারখানার ৫২টিই বাংলাদেশের। আমাদের এই অর্জনই নির্দেশ করে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আমরা এখন নিজেরাই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

বেসিক কমপ্লায়েন্স এর গন্ডি পেরিয়ে আমরা এখন অ্যাডভান্স কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে কাজ করছি। কারখানাতে একজন শ্রমিক যেন হয়রানিমুক্ত পরিবেশে প্রফুল্ল চিত্তে, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে সেজন্য আমরা বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কারখানার জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, কারখানাতে বিদ্যমান ৩টি কমিটির কার্যক্রমকে গতিশীল এবং সক্রিয় করতে কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প, কর্মজীবী শ্রমিক মায়েদের শিশু বিকাশ নিশ্চিতে মাদারস এ্যাট ওয়ার্ক প্রকল্প।

চিত্র-০২ 'মাদারস এ্যাট ওয়ার্ক' প্রকল্প স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি ও কর্মকর্তাবৃন্দ

কারখানাতে একজন শ্রমিক যদি কোন ধরনের সহিংসতা অথবা হয়রানির শিকার হয়, তাহলে সেটি তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে এবং তার উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে। প্রয়োজনীয় সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট ধারণার অভাবে অনেক শ্রমিক জানেই না কোনটি হয়রানি আর কোনটি হয়রানি না। হয়রানির শিকার হলে অভিযোগের পদ্ধতিইবা কী হবে? অথচ আমাদের কারখানাতে যেকোন ধরনের যৌন হয়রানি একটি জিরো টলারেন্স ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয়। কেবল এই সামান্য সচেতনতার অভাবে কারখানাতে হয়ত অনেক নারী শ্রমিক মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে পারে, যা তার মধ্যে মানসিক ট্রমা তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার বিকল্প সহায়ক আর কিছু হতে পারেনা। সেই বিবেচনায় আমরা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহায়তায় কারখানাতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প সম্পন্ন করেছি।

কর্মজীবী দুগ্ধদানকারী মায়েরা যেন তাদের সন্তানকে কারখানার শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে, নিয়মিত ব্যবধানে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে, সেই লক্ষ্যে আমরা ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় কারখানাতে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার স্থাপনে পরামর্শ সহায়তা প্রদানসহ নারী শ্রমিকদের শিশু বিকাশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করেছি। কর্মজীবী মা যদি মানসিক চাপের মধ্যে থাকে তাহলে তার কাজের গতিও ব্যাহত হয় এবং ভুলের পরিমাণও বেড়ে যায়। এছাড়া গবেষণা তথ্য মতে, নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাবার অন্যতম কারণও সন্তান লালন-পালন। তাই কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অবস্থান সুসংহত করতে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

চিত্র-০২ নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাবার অন্যতম কারণও সন্তান লালন-পালন। তাই কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের অবস্থান সুসংহত করতে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বিকেএমইএ তার নিজস্ব অবস্থান থেকে নিটওয়্যার সেক্টরের শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে বদ্ধপরিকর। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রযুক্তির উন্মুক্ত আহবানে সাড়া দিয়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোকেও গ্রহণ করতে আমাদের শিল্পমালিকদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তবে এই চ্যালেঞ্জ শুধু আমাদের জন্যই না, এই চ্যালেঞ্জ সকলের। আমাদের যত উন্নয়ন, ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনেরা। যুগের চাহিদার সাথে অভিযোজিত হয়েই আমাদের টেকসই বিশ্ব গঠন করতে হবে। বিকেএমইএ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তাঁর সুদূরপ্রসারী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কারণে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যে শিল্পবিপ্লবের কথা আমরা এখন বলছি, শিল্পখাতে তার প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক আগেই চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। একসময় বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে আর আজকে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ উন্নত দেশের প্রতিটি স্তম্ভ স্থাপন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নপূরণের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে তিনি সদর্পে মোকাবিলা করেছেন। নিট পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণে তার সহযোগিতার হাত আমাদের চলার পথকে মসৃণ করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই চ্যালেঞ্জকে আলিঙ্গন করেই আমরা বিশ্বের বুকে নিজেদের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করবো সেরার সকল মানদণ্ডে।

Smart production is good for business and the working environment

Ole Justesen
Sector Counsellor,
Royal Danish Embassy, Bangladesh.

Decent work, economic growth, and greener production are shared priorities for Bangladesh and Denmark. Bangladesh has taken important steps in transitioning to sustainable production. Yet, continued investments in occupational health and safety, along with green technology, are essential for ensuring sustained competitiveness of industries and workers' well-being.

Labour inspectorates can play a role in companies' transition to sustainable and smart production. After more than seven years of successful implementation, the Strategic Sector Cooperation (SSC) in Bangladesh on Occupational Safety and Health (OSH) between the Danish Ministry of Employment and the Bangladeshi Ministry of Labour and Employment has entered its third and final phase. The Danish and Bangladeshi labour inspectorates are spearheading the project's implementation. As labour inspectorates, their core responsibilities are to enforce the labour law and provide information and guidance to factories to enable them to work systematically with OSH.

However, motivating companies to improve their working environment and provide healthy and safe workplaces is equally important, and if workers' well-being is not enough motivation, other compelling arguments exist. Numerous studies worldwide show that a safe and healthy working environment, high productivity, and high product quality go hand in hand. The Garment Industry in Bangladesh is a case in point. A recent study supported by the Danish Government and carried out in cooperation between Ahsannulah University of Science and Technology, University of Southern Denmark and BGMEA demonstrated that improvement of OSH is interlinked with improvement of productivity and quality. The new BGMEA innovation centre is now using this experience to organise networks for garment factories aimed at integrated improvement of OSH, productivity and quality.

The Bangladeshi Labour Inspectorate (DIFE) is currently establishing a National Occupational Health and Safety Institute, which will offer training to various stakeholders from the labour market. Under the auspices of the SSC Project, DIFE has developed sector-oriented courses for the food, leather, tanneries, chemical/plastic, and rerolling industries. Additionally, two courses in boiler safety have been developed, one for operators and one for managers. The courses aim to provide knowledge and tools to

companies to work systematically with OSH, motivate companies to create decent workplaces for their workers, and provide a platform for companies to network and discuss solutions to sector-specific OSH challenges.

Smart production is a way forward to improve safety and health on an even larger scale. Factory owners must realise that quality, productivity and working environment are interrelated and often linked to environmental and climate actions. For example, investments in technology and management tools can be designed to eliminate or reduce the use of chemicals in production, reduce the use of chemicals in production, thereby lowering the risk of occupational hazards and the discharge of hazardous chemicals into the environment. The environment and climate are high on Denmark's priorities, and the Embassy of Denmark aims to support the green transition in Bangladesh steadily. Such efforts include Denmark's financing of IFC and the BGMEA's Partnership for Cleaner Textile (PaCT), which helps factories become sustainable by identifying and proposing tailored technological solutions provided byprominent private sector companies that could lead to improvements in environmental performance and resource efficiency.

The sector cooperation and PaCT offer valuable solutions to creating a safer, healthier working environment and cleaner production. The close cooperation between Bangladesh and Denmark is an example of how countries can take steps to promote the green agenda, improve the quality of life for workers, and simultaneously increase productivity, resulting in a mutually beneficial outcome for all parties involved.

তৈরি পোশাক শিল্প, শোভন কর্মপরিবেশের পথিকৃৎ

ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য সামনে নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উদযাপন করে আসছে।

সরকারের এই জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' কেবল শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তি। শ্রমিকের সুস্থতা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা সরাসরি সম্পৃক্ত। টেকসই শিল্প গড়ে তুলতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুস্থতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রায় ৪ দশক আগে যাত্রা শুরু করার পর থেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ধারাবাহিকভাবে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। যেকোন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে শিল্পটি অনেক বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করে আজ অত্যাধুনিক ও নিরাপদ পোশাক উৎপাদনের সবুজ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শিল্পটি এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক, যা বংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে প্রায় ৮২ শতাংশ অবদান রাখছে।

গৌরবের বিষয় হলো, আমাদের পোশাক খাতে এমন অনেক অসামান্য অর্জন রয়েছে, যার জন্য এ শিল্পের উদ্যোক্তারা এবং শিল্পকে নেতৃত্বদানকারী নেতারা ন্যায়সঙ্গতভাবেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

এ শিল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে আমাদের শ্রমিক ভাইবোনেরা। তাই তাদের সকল অধিকার সমুন্নত রাখতে আমরা সদা তৎপর রয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, তাদের অধিকারগুলো আরও সুরক্ষিত রাখার জন্য ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে শ্রম আইন সংস্কার করা হয়েছে। সংশোধিত আইনে প্রতিটি কারখানায় নিরাপত্তা কমিটি (সেফটি কমিটি) এবং নির্বাচিত অংশগ্রহণ কমিটি (ইলেক্টেড পার্টিসিপেশন কমিটি) গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এছাড়াও, ২০১০ সাল থেকে পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ৩৮১ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইন অনুসারে মজুরি বৃদ্ধি বাধ্যতামূলক। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিলও গঠন করা হয়েছে, যেখানে পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা অবদান রাখছেন। গত অর্থবছরে আমরা পোশাকখাত থেকে প্রায় ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এই তহবিলে দিয়েছি, যা আগামী দিনগুলোতে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সাথে যুগপৎভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ তহবিল থেকে শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের কারখানাগুলোকে শ্রমিক ভাইবোন ও কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত এবং টেকসই কর্মক্ষেত্র করার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন এবং পোশাক শিল্প মালিকদের সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কমিটিও (টিসিসি) গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি শ্রম ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করছে।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রামে ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে একটি হাসপাতালের মাধ্যমে শ্রমিক ভাইবোনদেরকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব থেকে প্রতিমাসে প্রায় ১১ হাজার শ্রমিক ভাইবোন স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছেন।

আইএলও এর সহযোগিতায় বিজিএমইএ এর সদস্যভুক্ত পোশাক কারখানাগুলোতে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও হয়রানি দূরীকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আমরা পোশাক কারখানায় কাজ করা মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগও তৈরি করেছি। বর্তমানে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে ৬০ জন তরুণ নারী কর্মী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছেন। আমাদের অনেক কারখানাই নিজ নিজ ভবনের প্রাঙ্গনে শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান ও তাদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করছে। শিল্পে এ ধরনের আরও অনেক ভালো চর্চা/উদ্যোগের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে সদস্য কারখানাগুলোকে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। সেইসাথে নতুন সদস্য কারখানা অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আইনের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবন নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার বিষয়টিও কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়াতে উত্তরাস্থ বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে একটি উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় কারখানার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, একই সাথে কারখানায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএসএইচ) নিশ্চিত করা। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্প ও উৎপাদন পরিকল্পনা প্রকৌশল এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্নাতকদের জন্য বৃত্তিমূলক এবং চাকুরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বিগত এক দশকে তৈরি পোশাকখাতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, টেকসই উন্নয়ন ও শ্রমিকদের কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিল্পের এসব অর্জনের জন্যই ডিজনীর মতো একটি ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে সোর্সিং বন্ধ করার পর আবার সোর্সিং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পূনঃবহাল করেছে। শিল্প এই অর্জনগুলো আগামী দিনগুলোতে ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হংকংভিত্তিক কিমা'র জরিপ অনুযায়ী, ইথিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

আজ আমাদের পোশাক কারখানাগুলো কেবল নিরাপদই নয়, বরং আরও গতিশীল, আধুনিক, জ্বালানি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠেছে। ইউএসজিবিসি কর্তৃক প্রত্যয়িত সর্বাধিক সংখ্যক সবুজ কারখানার আবাসস্থল, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ এবং সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব পোশাক প্রস্তুতকারক দেশ হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। আমাদের এখন ১৯২টি লিড গ্রিন কারখানা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ৬৮টি প্লাটিনাম রেটেড এবং ১১১টি গোল্ড রেটেড। বিশ্বের শীর্ষ ১০টি গ্রিন কারখানার মধ্যে ৮টি বাংলাদেশে অবস্থিত। ২০২২ সালে আমাদের ৩০টি কারখানা গ্রিন হয়েছে। কোন একক বছরে এটাই সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রিন কারখানার সংখ্যা। বিজিএমইএ জলবায়ু বিষয়ে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি চার্টার এবং জাতিসংঘ গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উদ্যোগেও যুক্ত হয়েছে।

উল্লিখিত এই পদক্ষেপগুলো পরিবেশগত টেকসই উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণে আমাদের অটল প্রতিশ্রুতির কথাই তুলে ধরে।

সম্প্রতি বিজিএমইএ এর সাসটেইনেবিলিটি স্ট্র্যাটেজিক ভিশন-২০৩০ ঘোষণা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পের প্রবৃদ্ধি এমনভাবে অর্জন করা, যা একাধারে টেকসই হবে এবং গ্রহ ও মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। এ রূপকল্প অনুযায়ী আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক শিল্পে ১০০% লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং ১০০% নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও শোভন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা কৃতজ্ঞ যে বর্তমান ব্যবসা ও শ্রমিকবান্ধব সরকার শ্রমিক ভাইবোনদের জন্য শোভন, সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিসহ তাদের সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছে। এছাড়াও সরকার 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। পরিদর্শন বিভাগ ও শ্রম অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাজশাহীতে OSH ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

একটি ব্র্যান্ড বা রিটেইলার এর ধারণায় সর্বোচ্চ নিরাপদ শিল্পের সংজ্ঞা যা হতে পারে, আমরা শিল্পকে সে পর্যায়েই আনতে সক্ষম হয়েছি। আজ আমাদের প্রতিটি পোশাক প্রতিষ্ঠান, এমনকি সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিও জানে নিরাপত্তার কোনও বিকল্প নেই; বিধি-বিধান প্রতিপালন ও শিল্পের উন্নয়নের কোনও বিকল্প নেই। শিল্পের জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে।

শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সুরক্ষার বিষয়টি একটি মাল্টি-সেক্টরাল ইস্যু, যেখানে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের দায়িত্ব রয়েছে। একেকটি কারখানায় ৫-৩০ কোটি টাকা বাড়তি বিনিয়োগ করে নিরাপদ করা হয়েছে। অথচ ক্রেতারা দাম বাড়াচ্ছেন না। পোশাক শিল্পে চলমান উদ্যোগকে বাস্তবায়ন করার জন্য ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা এবং ক্রেতা ও ভোক্তাদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী। শ্রমিককের সুস্থতা ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার সাথে উৎপাদনশীলতা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

সম্প্রতি সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রকাশ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পোশাক শিল্প সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে শিল্প আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, এটাই কাম্য।

পরিশেষে বিজিএমইএ এ বছরের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের প্রতিপাদ্য 'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছে।

OSH at the Enterprise level: Progress and Priorities

Mohamad Anis Agung Nugroho
Programme Manager
ILO Better Work, Bangladesh

Sikder Mohammad Tawhidul Hasan
Enterprise Advisor & OSH Specialist
ILO Better Work, Bangladesh

In June 2022, the International Labour Conference amended the International Labour Organization's (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) to incorporate "a safe and healthy working environment" as a fundamental principle and right at work.

Bangladesh's garment sector, which employs millions of people, makes a significant contribution to the country's economy. However, a series of catastrophic accidents, including the 2013 Rana Plaza collapse, brought global attention to the unsafe working conditions in Bangladesh's garment factories.

It became evident that substantial improvements in safety, inspection, and compliance were mandatory if the lives of more than four million employees were to be secured and the trust of international brands maintained.

Building Back Better

Bangladesh has made major strides in improving workplace safety and health (OSH) in the years since the catastrophes. Thousands of factories were inspected for electrical, fire, and structural safety. A wide range of safety remediation and improvement measures were taken. Tens of thousands of employers and workers were educated and trained on occupational safety and health. The Bangladesh Labour Act of 2013 was passed, updating the nation's labour laws, and establishing new provisions for workplace safety.

With assistance from ILO and other allies, the inspection system was improved and reinforced. Other upgradations to the inspectorate system were made as part of the Department of the Inspection of Factories and Establishments' (DIFE) restructuring plan. For instance, the Labour Inspection Management App (LIMA), which collects data using tablet computers, information and knowledge management systems that improve data processing and transparency, and many others. DIFE developed a safety committee training manual that was tested in 100 factories in 2016 to determine safety committee duties and responsibilities. The department also operates a hotline to receive and resolve grievances from workers.

The Accord on Fire and Building Safety was established with the help of international communities and advocacy groups to improve factory safety through inspections, training, and other measures. ILO initiated programmes to assist the execution of the National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity. (NTPA). For factory-level

engagement, ILO launched the Better Work Bangladesh programme in collaboration with the International Finance Corporation (IFC) to improve working conditions and promote business competitiveness by promoting compliance with international labour standards and national law.

The Better Work model starts by getting to know each factory's details, establishing trust in the program, and suggesting factories to take complete ownership of compliance issues. The first step involves that every factory conducts a self-evaluation of its working conditions with the support of Enterprise Advisors. Interactions with factories extend beyond offering advisory services and include developing factory development plans, assisting them in identifying compliance shortcomings and evaluating the level of expertise of their Worker Participation Committees in relation to their ability to deal with compliance concerns.

Better Work has collaborated with 48 international brands and supported around 450 factories with 1.26 million workers, 54% of whom are female, as of April 2023. Advisory visits and meetings for developing compliance improvement plans, training on leadership skills, financial literacy, industrial relations, and collaboration in the workplace are examples of activities. The programme fosters an enabling environment for worker organisations and collective bargaining at the factory level, as well as worker engagement with occupational safety and health and rights issues. Given that most garment workers are women, a particular focus is being put on educating women trade union leaders and organisers on essential labour rights.

There have been efforts made to support paid maternity leave, breastfeeding support, and day-care services while also promoting the strengthening of maternity rights. ILO and DIFE collaborated to incorporate maternal protection requirements in the workplace compliance check lists.

ILO is collaborating with the government and industry stakeholders to extend the Better Work Model beyond RMG industries. The ILO Learning Hub initiative was introduced in July 2020 as a knowledge platform for government, national institutions, employers, and workers skill development; and knowledge generation and sharing for the advancement of decent work, including OSH. Better Work is collaborating with government institutions including DIFE, industry actors, and the private sector to promote best practises in other promising sectors such as pharmaceuticals, footwear, and food processing. Scaling of learning in thematic areas like OSH will be accomplished through jointly agreed-upon engagement modality with industry actors and international brands.

Photo: Two members of the safety committee at an ILO Better Work programme supported garment factory in Dhaka.

OSH STILL REMAINS A PRIORITY

The safety of the workplace has greatly improved in Bangladesh because of collective efforts. As workers, employers, and authorities in Bangladesh became more aware and mindful of OSH issues, and the number of workplace fatalities dropped. But there have been bumps along the way, and there are still major challenges to be addressed. Basic safety protocols and tools are lacking in many factories, and workers often face long hours, inadequate wages, and adverse conditions at work.

Management's dedication and workers' active participation are both necessary for the enterprise-level implementation of successful OSH practises. Incorporating it into every part of the business, from production and maintenance to planning and design, is also critical. Businesses can provide a safer and more productive work atmosphere for their workers by putting a high priority on workplace safety and health.

The ILO Convention No. 187 recognizes that the principle of prevention is to be given the "highest priority," as it is fundamental to OSH. The ILO Convention 155 outlines the major obligations of employers as well as the fundamental duties and rights of employees and their agents. Employers are responsible for ensuring that the workplaces, machinery, equipment, and processes that they control are safe and do not pose a risk to health; that the chemical, physical, and biological substances and agents that they use do not pose a risk to health; that sufficient protective clothing and protective equipment are provided to reduce the risk of accidents or other negative health effects; and that measures are taken to deal with emergencies and accidents, including necessary first-aid arrangements.

It is critical to emphasise that worker health goes beyond the absence of illness or incapacity. The "physical and mental aspects of health that are directly related to safety and hygiene at work" are also included. The conventions also emphasise the steps that must be taken to ensure that workers and their reps collaborate with the employers, receive the proper training and information, and are informed on all OSH issues relating to their work.

The activation of the safety committee, capacity building, deployment of effective risk management at the enterprise level, improved coordination between management and workers, and worker empowerment for women are just a few of the areas that should be prioritised to improve the OSH culture in the factory.

The following are some notable OSH standards that can be adopted at the factory level:

- Risk assessments: Undertaking routine risk analyses to identify probable workplace hazards, such as physical, chemical, and ergonomic hazards.
- Safety equipment: Personal protective equipment (PPE) and safety guards for machinery and instruments are examples of safety equipment provided without any cost to the workers.
- Training and awareness: Providing continuous training and informational sessions for workers and management on job safety and health issues. This includes education on how to use safety gear and processes properly and on how to spot and report dangers.
- Health and wellbeing: Promoting employee health and welfare by offering tools such as ergonomic workstations, healthy food choices, and chances for physical exercise.
- Reporting and investigation: establishing a method for reporting accidents and injuries and carrying out investigations to find the underlying causes of incidents and take remedial action.
- Continuous improvement: it involves reviewing and updating OSH policies and procedures on an ongoing basis to ensure that they stay effective and pertinent.

Photo: Two members of the safety committee at an ILO Better Work programme supported garment factory in Dhaka.

OSH IS EVERYONE'S RESPONSIBILITY

Bangladesh's progress on the decent work agenda, including OSH, can be attributed to the solid partnership of key actors, including the Ministry of Labour and Employment, DIFE, DoL, employers' associations, including the Bangladesh Employers Federations (BEF), Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), workers associations, including the National Coordination Committee on Workers' Education (NCCWE), and the IndustriALL Bangladesh Council (IBC).

The issue of OSH cannot be handled in isolation because it is intertwined with several other factors such as industrial relations, workers' rights, and positive environment for continuous dialogue between the government, employers, and trade unions.

The International Labour Conference 2022 Resolution on the inclusion of OSH in the ILO's framework of fundamental principles and rights at work recognises the vitality of dialogue and collaboration among social partners. It states that "a safe and healthy working environment requires the active participation of governments, employers, and workers through a system of defined rights, responsibilities, and duties, as well as through social dialogue and cooperation."

Therefore, it is critical for all stakeholders to work together to continue making progress towards improving workplace safety in Bangladesh. This includes the government, factory owners, workers, international brands, consumers, and the media, who can increase awareness and stand for safe and decent work.

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ: ফায়ার সেফটি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন
বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি, জি, এম ফিল
মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সারথি এই প্রতিষ্ঠানটি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত আয়ের দেশে পরিণত হতে দেশে হচ্ছে নগরায়ন, বহুমুখী শিল্পায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সাথে সাথে বহুতল ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ। আর এই উন্নয়নের ফলে বাড়ছে অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও ঝুঁকি প্রশমনের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। এই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য, অগ্নিনির্বাপন ও অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বমূলক যৌথ উদ্যোগ।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কার্যক্রম ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুযোগ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্ঘটনায় প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্নিপ্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, জরুরি রোগী পরিবহন, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ, র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন, ভিআইপিদের অগ্নিনিরাপত্তা প্রদান, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের সেবায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত।

২০০৯-২০২২ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সদস্যগণ ২,৫৩,৮৯৮টি অগ্নি দুর্ঘটনায় অংশগ্রহণ করে ৮৮৩৮জন ব্যক্তিকে জীবিত এবং ২১৯১ টি মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি দেশের ২,১০,৮৩৯ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করেছে। এছাড়া দুর্যোগ প্রতিরোধে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ফায়ার সার্ভিস বিভিন্ন ভবনে মহড়া, সার্ভে কার্যক্রম এবং নাগরিককে অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও আহত সেবা বিষয়ে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ফায়ার লাইসেন্স ইস্যু ও ফায়ার সেফটি প্লান বাস্তবায়নের মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপণী ব্যবস্থা নিশ্চিত ও ভবন ব্যবহারকারীদের সুরক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ রাখছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। দুর্যোগ দুর্ঘটনায় সবার আগে এই প্রত্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা ২০১৫-২০২২ মেয়াদকালে ৪৮৩৬৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬৬৩১৫ জন আহত ও ৯৩৩৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করে আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ ও মৃতদেহগুলোকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যস্থতায় স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করেছে যা মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা। এতে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত বিনিয়োগ করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে প্রথম সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেল ঘোষণা করে। অগ্নিদুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অগ্নিদুর্ঘটনার সংখ্যা ও ঝুঁকি হ্রাস করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাত্র ৭ টি অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনায় ১ হাজার ৪৭৫ জন নিহত ও ৩ হাজার ১১০ জন আহত হয়। এছাড়া ২০২২ সালে অগ্নিকাণ্ডে ৩৭৭ জন আহত ও ৮৫ জন নিহত। অন্যদিকে সারাদেশে ২০২২ সালে মোট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ২৪ হাজার ১০২টি। এতে ৩৪২ কোটি ৫৮ লাখ ৫১ হাজার ৩৮৯ টাকার সম্পদের ক্ষতি

হয় এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজ করে ১ হাজার ৮০৮ কোটি ৩২ লাখ ৬৪ হাজার ৬৬০ টাকার সম্পদ রক্ষা করে। এরকম বিপুল সম্পদের ক্ষতি ও প্রাণহানী দেশের উন্নয়নের পথে অন্তরায়। পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, রাস্তার ট্রাফিক ও ফায়ার স্টেশন থেকে দুর্ঘটনা স্থলের দূরত্ব, ভবনগুলোতে স্থায়ী অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা, প্রশিক্ষিত জনবল না থাকাসহ অন্যান্য কারণে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা বাড়ছে ও আগুনের সূত্রপাতের শুরুতেই নির্বাপন করা যায় না। এসব ঝুঁকি প্রশমনে অন্যান্য উদ্যোগের সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমুলক কার্যক্রম।

কি ধরনের কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে?

মিনি/স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণ

বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা একই এলাকার কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য বা নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য মিনি/স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করতে পারেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ ও সাজ সরঞ্জাম ক্রয় প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করা যেতে পারে। পুরাতন ঢাকায় এই স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণ এখন সময়োপযোগী ও অগ্নি নির্বাপণে অসাধারণ উদ্যোগ হতে পারে।

ভলান্টিয়ার তৈরি

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শহরভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে সহযোগিতার জন্য ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। অর্থায়ন করলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সতেজকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তার জন্য ফায়ার কর্মী নিয়োগ প্রদান করবেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ

অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বেসরকারি উদ্যোগে ফায়ার স্টেশনগুলোতে অগ্নিনির্বাপণ ও সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিকটবর্তী ফায়ার স্টেশন হতে এসব সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পক্ষ থেকে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নির্ধারণসহ ক্রয় প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে পারে।

অগ্নি নির্বাপণ সাজ সরঞ্জাম উৎপাদন

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারিভাবে যৌথভাবে অগ্নিনির্বাপণী সাজ সরঞ্জাম যেমন-ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হোজরিল, ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম এর পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। এসব পণ্য উৎপাদনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অংশীদার হতে পারে। এতে করে পণ্যের গুণগত মান ও সর্বনিম্ন দামের নিশ্চয়তার সুযোগ তৈরি হবে।

প্রশিক্ষণ প্রদান

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। এসব প্রশিক্ষণে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও দেশে বিদেশে যেমন প্রশিক্ষণ নিবে তেমনি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীরাও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। বর্তমানে নিজস্ব অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যাচ্ছে, যার সংখ্যা প্রতিমাসে আটশত এরও অধিক।

আর্থিক সহযোগিতা ও নির্বাপণ ব্যবস্থা

বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থা থাকলে তাদের আলাদা ছাড় বা সুদ হার নির্দিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে। আর এই অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। এতে করে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণ হবে, সাথে সাথে ভবনের স্থায়ী অগ্নি নির্বাপণীও ব্যবস্থা গড়ে উঠলো।

পরিবহন সমিতি ও যানজট

ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে অগ্নিকাণ্ডস্থলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে যানজটের কারণে। অনেক সময় দেখা যায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দেখেও রাস্তা ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা থাকে না ড্রাইভারদের মধ্যে। তাই পরিবহন সমিতি ও ফায়ার সার্ভিস যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে এই সমস্যা কমিয়ে আনা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সময় দাহ্যবস্তু পরিবহনের সময় অসচেতনতা ও দাহ্যবস্তু পরিবহনের গাইডলাইন না জানার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এ বিষয়ে পরিবহন সমিতি ও ফায়ার সার্ভিস একসাথে কাজ করতে পারে।

অ্যাম্বুলেন্স সেবা

সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জরুরি মেডিকেল সার্ভিস প্রদান করা যেতে পারে। ২০২২ সালের অগ্নিকাণ্ড ব্যতীত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ১৩ হাজার ১৬৮ জন আহত ও ২ হাজার ৫১৯ জন নিহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। এছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২০২২ সালে ৩৭৭ জন আহত ও ৮৫ জন নিহত উদ্ধার করে। বর্তমানে সারাদেশে ১৯৫ টি অ্যাম্বুলেন্স

মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে। দেশের বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। অথবা দেশের সকল অ্যাম্বুলেন্স সেবা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর অধীনে পরিচালনা করা যেতে পারে।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

জনগণকে সচেতন ও অগ্নিপ্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম যৌথ উদ্যোগে করা যেতে পারে। যেমন: সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, লেকচার প্রেজেন্টেশন, গ্রুপ ডিসকাশন। এছাড়া শিশুদের জন্য অগ্নিকাণ্ডকালীন করণীয় বিষয়ক কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে। এতে জীবনের ঝুঁকি ও জীবন রক্ষার কৌশল শিখতে পারবে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর অগ্নি প্রতিরোধমূলক এই গণপ্রচার কার্যক্রম বিনা অর্থায়নে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে।

যৌথ মহড়ার আয়োজন

অগ্নিনির্বাপনী ও উদ্ধার কার্যক্রমের সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মিলে দুর্যোগকালীন সাড়া প্রদানের যৌথ মহড়ার আয়োজন করবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সাজ সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করবে। অথবা সারাদেশে বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একযোগে মহড়ার আয়োজন করতে পারে। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, জাপানে টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি সরকারি সহযোগিতায় দুর্যোগকালীন করণীয় জরুরি ড্রিল এর আয়োজন করে থাকে।

দুর্যোগ প্রশমন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ও উদ্ধার কার্যক্রম নিয়ে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। এই গবেষণাগার থেকে কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমানো যায়, কিভাবে দুর্ঘটনা কমানো যায়, অগ্নিকাণ্ডের ফরেনসিক, ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার-পুনর্গঠন বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কোর্স, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা চালু ও গবেষণা কাজ করতে পারে।

এলাকাভিত্তিক উন্মুক্ত উদ্ধার সরঞ্জাম সংরক্ষণ

দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য খোলা জায়গায় উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামসহ কন্টেইনার সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। যেমন ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোগে উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামসহ কন্টেইনার সংরক্ষিত রাখা হবে। যা দুর্যোগকালীন ব্যবহার এবং শান্তিকালীন এই মালামাল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে।

দুর্যোগকালীন যৌথ কার্যক্রম

সরকারের সাথে অগ্নিকাণ্ড পরবর্তী কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কি কি ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা শান্তিকালীন সময় পরিকল্পনা করা হবে। যেমন ঢাকার গুলশান ২ একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে স্থানীয়ভাবে কোন হাসপাতাল স্বাস্থ্য ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা দিবে, কোন প্রতিষ্ঠান খাবার সরবরাহ করবে। কোন প্রতিষ্ঠান উৎসুক জনতা নিয়ন্ত্রণ করবে। কোন প্রতিষ্ঠান ত্রাণ কার্যক্রম করবে। এভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় যৌথ কার্যক্রমগুলো পূর্বেই ঠিক করা রাখা যেতে পারে যা অগ্নিকাণ্ডকালীন ও পরবর্তী সময় তা বাস্তবায়ন করা হবে।

পদক প্রদান

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অগ্নিপ্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের উপর পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো তাকে পদক প্রদান। অথবা কোন আবাসিক ভবনে প্রশিক্ষিত অধিবাসী, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, ফায়ার ড্রিল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ভবন ফায়ার সেইফটি পদক প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে আবাসিক, শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা এলাকাভিত্তিক পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দূর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি ও জনগণের কাছে সেবা সহজীকরণ, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই সমন্বিত কার্যক্রম ও উদ্যোগ দেশে অগ্নি নিরাপত্তা ঝুঁকি ও অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা, ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সংখ্যা সহনীয় ও গ্রহণীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনবে।

উপসংহার

দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর বর্তমান সরকারের আমলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য রিমোট কনট্রোল ভেহিক্যালসহ, গাড়ি, পাম্প ও আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ; জনবল বৃদ্ধি, বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোর মানোন্নয়ন করায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর অপারেশনাল কাজের সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতার ৬৮ মিটারের টার্নটেবিল লেডার যা দিয়ে ২৪ তলা পর্যন্ত উদ্ধার কাজ করা যায়। এই সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দেশ ও বিদেশে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করে সুনাম
কুড়িয়েছে। দুর্যোগপ্রবণ এ দেশে প্রথম সাড়া প্রদানকারী বাহিনী হিসেবে সবসময় সকল দুর্যোগে সবার আগে সবার পাশে থেকে সাধারণ মানুষের কাছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন দুঃসময়ের বন্ধু হিসেবে স্বীকৃত।

Improving Safety Culture through the Introduction of an Employment Injury Insurance

Syed Moazzem Hussain

Senior Technical Advisor

Social Protection for the Workers in the Textile and Leather Sector

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

The Employment Injury Insurance is a risk pooling scheme designed to provide wage replacement and medical & rehabilitation benefits to employees who are injured or become ill as a result of their work. This scheme is a critical component of the social security, ensuring that workers receive the support they need to recover and return to work following an injury or illness arising out of work. However, the benefits of the Employment Injury Insurance go beyond providing support to injured workers. An effective Employment Injury Insurance Scheme can have a positive effect on the safety culture of industries.

A safety culture is a set of attitudes, values, and behaviours that prioritize safety in the workplace. A strong safety culture can help prevent workplace accidents and injuries, protect workers' health and well-being, and increase productivity and profitability. Developing a safety culture requires a commitment from employers and employees to prioritize safety and make it an integral part of their daily work practices. The Employment Injury Insurance can play an important role in fostering a safety culture in an industry in several ways.

First and foremost, the cost of injuries includes not only the direct costs of medical treatment and wage replacement but also indirect costs such as lost productivity, replacement of injured workers, and increased contribution. These costs can be substantial, especially for small and medium-sized businesses. By improving safety in the workplace, employers can reduce the number of claims and save money on these costs.

One way that the Employment Injury Insurance motivates employers to improve safety is through the experience rating system. Under this system, employers are assigned a contribution rate based on their history of workers' compensation claims. Employers with a higher number of claims or more severe claims will have a higher contribution rate than those with fewer claims. This system creates an incentive for employers to improve safety in the workplace to reduce their contribution rates. By reducing the number and severity of workers' compensation claims, employers can improve their experience rating and lower their contribution rates. Many systems in The United States, Canada and Australia use the experience rating system. But closer to Bangladesh, Thailand is using the experience rating system to generate contributions from the employers. In Thailand, the Employment Injury Insurance institute assigns a basic contribution rate to each industrial sector. The overall range for the Employment Injury Insurance contribution ranges from

0.2% to 1%. After an industrial rate is assigned, an establishment contributes to the fund for four years. On the start of the fourth year, the injury incidence rate is calculated for the particular establishment. If the injury rate is lower than the industry average, then the establishment might get rewarded by decrease in contribution rate from 20% to up to 80%. The opposite can happen as well, meaning, if the injury rates increase, the establishment can find itself paying 20% to 150% more than the base industrial rate. This in turns incentivizes the employer to allocate resources to prevent injuries and hence improving the overall safety parameters. The approach also allows for industrial reforms as the base contribution is based on the overall industrial safety. Apart from individual employers' incentive, the industry overall has a stake in overall improvement.

Any Employment Injury Insurance stand in three basic pillars, namely Prevention, Rehabilitation and Compensation. Globally it has been observed that Employment Injury Insurances typically spend around 5% of the budget on prevention activities. Employment Injury Insurances can provide resources and support to employers to improve safety in the workplace. The Fund can provide education and training programs, safety audits, and consultations to help employers identify and mitigate workplace hazards. These resources can be especially helpful for small and medium-sized businesses that may not have the resources or expertise to develop comprehensive safety programs on their own. By providing these resources and support, the Employment Injury Insurance can help employers create a culture of safety in their workplaces.

Thirdly, the Employment Injury Insurance can play a role in promoting collaboration and communication between employers and employees on safety issues. The Fund can facilitate the development of joint labour-management safety committees, where employers and employees work together to identify and address workplace hazards. By working together, employers and employees can develop a shared understanding of the importance of safety and develop solutions that are practical and effective. This collaboration can help foster a culture of safety in the workplace and reduce the number of workplace accidents and injuries. In the case of Bangladesh, there is a solid legal base to already exercise this through the safety committees. Despite the legal obligations, the uptake of the participation committee, except for a few industries, is quite low. It can be fathomed that an Employment Injury Insurance can be the catalyst for activating functions of the safety committee.

At four, the Employment Injury Insurance can serve as a mechanism for sharing best practices and lessons learned on safety issues. The Fund can collect data on workers' compensation claims, including the types of injuries, the causes of accidents, and the industries and occupations where accidents are most common. By analysing this data, the Fund can identify trends and patterns in workplace accidents and injuries and develop strategies to address these issues. The Fund can also share this information with employers and employees, providing them with the knowledge and tools they need to prevent accidents and injuries from occurring.

Last but not the least, the Employment Injury Insurance can provide incentives for employers to implement safety programs and initiatives. For example, the Fund can incentivize safety culture in through:

Discounted premiums: Employment Injury Insurances can offer discounted premiums to companies that have strong safety cultures. This provides a financial incentive for companies to prioritize workplace safety. This can also be coupled with providing tax breaks as an additional incentive.

Safety awards: Employment Injury Insurances can also offer safety awards to companies that have demonstrated exceptional safety practices. These awards can include public recognition, monetary awards, or other forms of recognition.

Safety training programs: Employment Injury Insurances can offer safety training programs to companies to help them establish and maintain strong safety cultures. These programs can include training on hazard identification, risk assessment, and other key safety practices.

Risk assessments: Employment Injury Insurances can provide companies with risk assessments to help them identify potential safety hazards in the workplace. By identifying potential hazards, companies can take proactive steps to prevent workplace accidents and injuries.

On-site safety inspections: Employment Injury Insurances can conduct on-site safety inspections to evaluate a company's safety practices and identify areas for improvement. These inspections can help companies prioritize safety and implement necessary changes.

Overall, by offering incentives and support for safety culture, workers' compensation funds can help to create a safer workplace for employees and reduce the incidence of workplace accidents and injuries.

This should be mentioned that there are several factors that affect the safety culture. An Employment Injury Scheme merely acts a fluid in the process. There are different models and frameworks that describe the tiers or levels of safety culture, but one common model is the "Heinrich Pyramid" or the "Safety Culture Maturity Model". This model was developed by industrial safety pioneer H.W. Heinrich in the 1930s and has been adapted and refined over the years. The model consists of four tiers or levels:

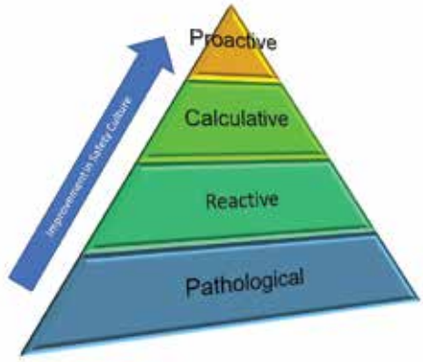

Figure 1: Safety Culture Maturity Model

Pathological: In this tier, safety is not a priority and accidents are seen as inevitable. The organization does not have a safety program, and there is little or no communication or cooperation on safety issues.

Reactive: In this tier, safety is seen as important only after an accident has occurred. The organization focuses on identifying the causes of accidents and implementing corrective measures, but there is little proactive effort to prevent accidents.

Calculative: In this tier, safety is integrated into the organization's processes and procedures, and there is a systematic approach to identifying and controlling hazards. Safety metrics are tracked and analysed, and the organization continuously strives for improvement.

Proactive: In this tier, safety is ingrained in the organization's culture, and employees are empowered to identify and address safety concerns. The organization takes a holistic approach to safety, including the physical environment, processes, procedures, and employee behaviours. Safety is seen as a shared responsibility, and there is a strong commitment to continuous improvement.

An establishment needs to self-assess where in the tier they stand and set targets for the graduation and based on these fix targets. To conclude it can be stated that despite various externalities, an Employment Injury Insurance fast tracks improvements in safety.

শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সময়ের চাহিদা

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা একটা মানুষের মৌলিক ও আইনগত অধিকার। করোনা মহামারি সারাবিশ্বের মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ মানুষের জন্য কতটা প্রয়োজন। অথচ কর্মপরিবেশের দিকে আমরা নজর খুব কমই দিয়ে থাকি। নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন: কর্মস্থলের পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল এবং তাপমাত্রার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, অগ্নিসংক্রান্ত ঘটনা, কৃত্রিম আর্দ্রকরণ, জনবহুলতা, অতিরিক্ত ওজন, বিল্ডিং ও যন্ত্রপাতির সুরক্ষা, যন্ত্রপাতিকে ঘেরাওকরণ, বিস্ফোরক দাহ্য গ্যাস ও বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিষয়ে সতর্কতা, ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জাম ব্যবহার, ঝুঁকি মূল্যায়ন, প্রতিরোধব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু সেটা কার্যকর হয়না। মালিক ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর একযোগে কাজ করলে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এমন কঠিন কিছু নয়। একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ প্রদান এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের অনুশীলন করা প্রত্যেক মালিকের নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। শ্রম আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করা।

দেশে শ্রম আইন আছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নেই। দেশে লক্ষ লক্ষ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কারখানা পরিদর্শকের পক্ষে কোনোভাবেই এই বিশাল পরিমাণ কারখানা পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শ্রম আইন ও অন্যান্য বিষয়ে মালিকদেরই সচেতন হতে হবে।

আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে মালিকরা এখনো কলকারখানার পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে চলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ট্যানারি শিল্প যখন ঢাকার হাজারীবাগে ছিল, তখনো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যে উদ্দেশ্যে হাজারীবাগের ট্যানারি শিল্প সাভারের হেমায়েতপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে তাও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। সেখানে পানির ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকেরা কোথায় থাকবেন তার ব্যবস্থা নেই। এখানে অনেক শ্রমিক রয়েছে যারা ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে কাজ করছেন। অনেক শিল্পে যেমন: জাহাজভাঙা, নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা জীবন-মরণ ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।

আশির দশকে গড়ে ওঠা পোশাক কারখানাগুলোতে শুরু থেকেই শ্রমিকরা নিরাপত্তা হীনতায় কাজ করেছে। পোশাক কারখানাগুলো প্রথমত আবাসিক এলাকায় এবং পরবর্তী সময়ে বহুতল ভবনে গড়ে তোলা হয়। বেশিরভাগ ভবনই ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মেনে নির্মাণ করা হয়নি। যেসব আবাসিক ভবনে পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে, সেগুলোর বেশিরভাগ ভবনেরই কারখানার যন্ত্রপাতির ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে না এবং ছিল না।

এর পাশাপাশি শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য ভালো ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ থাকলে তাঁদের উৎপাদনক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এতে মালিকেরা উপকৃত হবেন। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কাজ গুরুত্বের ভিত্তিতে শুরু করতে হবে। যেমন: যেসব ক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি খুবই কম বা নেই, সেখান থেকে শুরু করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য শিল্প মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্ধ রাখতে হবে।

এটা বিশ্বজনীন স্বীকৃত সত্য যে শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সুস্থ ও নিরাপদ থাকলে শিল্পে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে। পেশাগত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যয় কোনো খরচ নয়; বরং বিনিয়োগ-এই উপলব্ধি বাংলাদেশের

শিল্পমালিকদের মধ্যে এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে শ্রমিকরা এখনো কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে উভয় অবস্থায়ই বিপদগ্রস্ত। রানা প্লাজা ধসের পর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে পেশাগত নিরাপত্তার বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। পরবর্তীতে শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি।

আমাদের দেশের শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে তাদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তা খুবই অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত। দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে আইএলও কনভেনশন ১২১ ধারা অনুযায়ী লস অব ইয়ার, পেইন অ্যান্ড সাফারিং ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য। কিন্তু এখনো শ্রমিকদের ন্যায়সংগত এসব দাবি বাস্তবায়িত হয়নি। কর্মস্থলে আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ ওই শ্রমিকদের উপার্জন দিয়েই তার পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো হতো। মোট কথা, শ্রমিক ও তার পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তাই যখন কোনো কারখানা গড়ে তোলা হবে, তখন অবশ্যই তার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি কারখানায় যথাযথ অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জরুরি নির্গমনের পথ থাকতে হবে। যে ভবনে কোনো কারখানা গড়ে তোলা হবে, সে ভবনটি ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা তা পরখ করে দেখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঠিক না থাকলে সাধারণ শ্রমিক ও সেফটি কমিটিকে জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে মালিক, শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করতে হবে। একইসাথে কারখানা অবকাঠামো ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও উপকরণের মতো পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যয়কেও প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আমাদের দেশের বার্ষিক গড় আয়ের বড় অংশ আসে শিল্প খাত থেকে। তাই এসব শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকদের নিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এমন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব। এবিষয়ে যদি সঠিক ও যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে অব্যাহতভাবে উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে এবং এগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে কাজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।

শ্রমিকদের সব ধরনের বৈষম্য থেকে রক্ষা করার এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের শর্তাবলী শুধু শ্রম আইন ও বিধিমালায় থাকলেই চলবে না, তা বাস্তবায়নের জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পেশাগত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও নিয়োগকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পের বিকাশ এবং আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতিও গড়ে তোলা সম্ভব।

Ensuring Worker's Safety and Security: The Role of Enterprise Clinics

Mosrat Jahan
M&E Officer
Employment Injury Scheme (EIS) Project
ILO Country Office for Bangladesh.

What is an Enterprise Clinic?

An enterprise clinic is a medical facility located on the premises of a factory or industrial complex. The clinics are managed by the factory or the industry owners and run by qualified registered physicians (doctors) and skilled assistants (Nurses, Paramedics). These medical staffs are responsible for providing various medical services to the workers, including basic healthcare, emergency treatment, occupational health services, and health education. Bangladesh Labour Rules 2015 (BLR) emphasizes the importance of ensuring the health and safety of workers in the workplace. The establishment of enterprise clinic is one of the ways to meet this objective. As per the BLR, every factory needs to have at least one registered physician, and at least one medical assistant, nurse to assist the physician. The requirement for the size of Enterprise Clinics, human resources, equipment, and services depends on the size and nature of the factory .

Why Enterprise Clinics are important?

In Bangladesh, the ready-made garment (RMG) sector is the single biggest export industry, accounting for over 82.01% of the country's exports . This sector has created employment opportunities for 4 million people, among which the majority are women workers. Due to the workplace conditions and long-term occupational activities, the workers often suffer from chronic health problems such as respiratory diseases, musculoskeletal disorders, dermatitis, cardiovascular diseases, hearing loss, and malnutrition. In addition, they are frequently affected by some common diseases such as back pain, eye strain, headache, acidity, fatigue, jaundice, fever, abdomen pain, and cold . The existing healthcare systems cannot provide full protection to the workers due to a huge shortage of qualified healthcare providers in Bangladesh. The long working hours also constrain the workers from availing of external health services during normal operating hours . As a result, if RMG workers become unable to continue their work regularly, it will create an impact on national productivity. Considering this context, the need for factory-based enterprise clinics comes in, which can play a crucial role to provide much-needed healthcare facilities to the workers.

Are Enterprise Clinics really beneficial?

There are numerous benefits to have enterprise clinics inside the factories. It is a win-win situation for all stakeholders, i.e., the Government, Employers, and Workers. The clinic contributes to improving the country's overall public health status by providing medical care to the workers, reducing the spread of infectious diseases among their families, and promoting healthy lifestyles. It also helps to reduce public expenditure on health.

Enterprise clinic offers employment opportunities to healthcare staff and contributes to filling the gap of required healthcare professionals. With this step, the Government can make progress toward universal health coverage under Sustainable Development Goals (target 3.8). This on-site medical care facility reduces the extra burden of medical costs for workers as they get the service free or at a minimal cost. The workers can take timely measures to prevent major diseases and reduce the risk of workplace injuries and illnesses. By getting such a facility, workers have the motivation and dedication to work, which can help to reduce their absenteeism, and turnover rates. Employers can be benefitted from investing in workers' health and safety which leads to increased productivity. They can also save the production cost associated with workers taking time off for medical appointments or seeking healthcare externally. Enterprise clinic can help employers to ensure compliance with labor laws related to workplace safety and health. Lastly, it can strengthen the relationship between employers, workers, and the Government by promoting mutual understanding and cooperation.

Keeping in view the benefits of providing healthcare facilities to workers, major Employers' Associations have established a number of good health facilities on their own. The Bangladesh Garment Manufacturers' and Exporters' Association (BGMEA) runs 12 Health Centres that provide free healthcare facilities and medicines to more than 60,000 garment workers per year. Similarly, Bangladesh Knitwear Manufacturers' and Exporter's Association (BKMEA) operates a healthcare centre since 2009 and has treated more than 30,000 knitwear workers till date. The Employers' Associations are also promoting enterprise clinic establishment within their member factories. However, despite these initiatives, many challenges are still hampering the expected performance of these clinics as a model.

Current situation of Enterprise Clinics in Bangladesh

Based on the literature review of various research reports, the current scenario of enterprise clinics in Bangladesh is somewhat mixed. In recent years, there has been a growing concern among the major Employers' Associations to ensure workers' healthcare safety. Many of the factories in Bangladesh face challenges in complying with all the rules and regulations mentioned in Bangladesh Labour Act (2006) . Availability of qualified and full-time human resources is one of the major issues. Doctors are not available for the whole day. In absence of doctors, only nurses or paramedics treat the patients. There is a lack of necessary medical equipment and required medicines inside the clinics. The healthcare staff (nurse, paramedic) has inadequate knowledge of workplace diseases, common injuries, and factory-based emergencies . Because of cultural barriers and social stigma, female workers prefer female healthcare staff to get services. Workers are not aware of the healthcare policy, clinic services provision, and their entitlement. While labour inspectors possess knowledge of technical issues in healthcare facilities, additional training can enable them to create a more comprehensive assessment of enterprise clinics. There is no established referral system for complicated healthcare cases. The scenario is almost similar in medium and small factories, while large factories and factories with trade unions are comparatively in better situations.

Major challenges in establishing 'Model Enterprise Clinic'

A 'Model Enterprise Clinic' is one which fully complies with the requirements of Bangladesh Labour Rules 2015 (BLR). At present, there are several challenges faced by Employers to establish Model Enterprise Clinics. Doctors and nurses do not see any career growth here as there is no capacity-building or promotion opportunity for them. As a result, the retention of qualified professionals is another big challenge. There is a lack of clarity and harmonization between different Government Ministries and Employers' Associations regarding enterprise clinics. Enterprise Clinics need higher operational costs, and employers do not get any incentives or support from the Government in the establishment and operations of such clinics. It is not possible for employers to invest a vast amount for ensuring all the facilities and maintaining the quality of the enterprise clinics alone. There is no connection between enterprise clinics with mainstream healthcare institutions. Also,

enterprise clinics are not mainstreamed into Health Information System (DHIS-2) which can ensure appreciation for good work or accountability for quality services.

Initiative to promote 'Model Enterprise Clinics' in RMG Industries

Addressing the challenges of establishing a model enterprise clinic requires collaboration from multiple stakeholders, including the Government, Employers, Workers and international organizations. The Government of Bangladesh, in collaboration with Employers' and Workers' organizations, is continuously working to ensure workers' protection against the impacts of workplace accidents and occupational diseases in line with the ILO Convention on Employment Injury Benefits, 1964 (No. 121).

In this regard, on 21st June 2022, the Ministry of Labour and Employment (MoLE) in collaboration with the ILO and GIZ officially launched the Employment Injury Scheme (EIS)-Pilot. Enterprise Clinics are considered one of the most important elements of the EIS-Pilot as they are the first responders in case of any workplace accident or occupational diseases. As part of the EIS-Pilot, ILO is undertaking an initiative to facilitate Employers to establish and maintain 'Model Enterprise Clinics' through following interventions:

a. Developing 'Handbook on Model Enterprise Clinics' identifying specific requirements of BLR according to the size of the enterprise clinic. It provides clear guidelines, and checklists to establish model enterprise clinics.

b. Developing a 'Sustainability Guide for Employers' for enabling them to economize major cost-intensive elements of Enterprise Clinics and making it affordable to meet crucial components of Clinics such as retention of qualified human resources, health staff's capacity-building, provision of equipment and medicines, awareness raising of workers, and incentive packages for healthcare staff.

c. Implementation of handbook on model enterprise clinics and sustainability guide in 30 Enterprise Clinics through BGMEA and BKMEA.

With these initiatives, a process for establishing 'Model Enterprise Clinics' in RMG Industries will initiate which will, in future, evolve into a proper accreditation process to ensure good quality healthcare services to RMG workers.

---

[1] Bangladesh Labour Rule (2015) Section 77 and 78;
http://www.dol.gov.bd/sites/default/files/files/dol.portal.gov.bd/page/e56eea7e_0943_4fae_bfd5_5326098aad51/Labour%20Rules%202015.pdf

[2] https://www.bgmea.com.bd/page/Export_Performance

[3] Kabir, H., Maple, M., & Usher, K. (2019). *Health vulnerabilities of readymade garment (RMG) workers: a systematic review.* BMC Public Health, 19(1).https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334416/

[4] BSR, Healthcare Delivery in RGM Factories in Bangladesh (2014).
https://www.bsr.org/reports/BSR_Healthcare_Delivery_in_RMG_Factories_in_Bangladesh.pdf

[5] Mia, R., Ahmed, T., Tanjim, N., Waqar, A., Hasan, M., Das, A., Shamim, A. M., & Jahan, K. (2020, July 27). *An extensive analysis of the health hazards for RMG workers in apparel sector of Bangladesh.* Journal of Textile Engineering & Fashion Technology, 6(4). https://doi.org/10.15406/jteft.2020.06.00242

[6] BSR, Healthcare Delivery in RGM Factories in Bangladesh (2014).
https://www.bsr.org/reports/BSR_Healthcare_Delivery_in_RMG_Factories_in_Bangladesh.pdf

বাংলাদেশে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি: সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) যা ভাবছে

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

শ্রমিক, দিনমজুর, কর্মচারী যে নামেই অভিহিত হোক না কেন মজুরির বিনিময়ে মালিকের অধীনে কোনো ব্যক্তি কাজে নিয়োজিত থাকলে তাকে শ্রমিক বলা হয়। নিজের ও পরিবারের স্বার্থে শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সকল শ্রমিকের অধিকার। ২০১৬-১৭ লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন শ্রমশক্তি রয়েছে যার মধ্যে ৬০ দশমিক ৮ মিলিয়ন কর্মে নিযুক্ত আছে। যার মধ্যে ৪২ দশমিক ২ মিলিয়ন পুরুষ ও ১৮ দশমিক ৬ মিলিয়ন নারী বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রেখেছে। মোট শ্রমশক্তির ১৬ দশমিক ৯ মিলিয়ন শহরে এবং বাকী ৪৩ দশমিক ৯ গ্রামে কাজ করছে। দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই, কৃষিখাতে ২৪ দশমিক ৭ মিলিয়ন, তারপরই রয়েছে সেবা খাত যেখানে ২৩ দশমিক ৭ মিলিয়ন এবং শিল্প খাতে ১২ দশমিক ৪ মিলিয়ন শ্রমশক্তি কাজ করছে।

প্রশ্ন হলো, সব মিলে এই বিশাল শ্রমশক্তির পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন এবং তা কতটুকু মানা হচ্ছে? আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু খাতের দিকে যদি নজর দিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারি।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু কমছে না

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার চিত্র দেখলে বোঝা যায় নিরাপত্তার অভাবেই ব্যাপারগুলো ঘটছে এবং বাড়ছে। বিগত ১০ বছরে (২০১৩-২০২২) সেক্টরভিত্তিক কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় উৎপাদন খাতে ১ হাজার ৯৭৯ জন (রানা প্লাজার ১ হাজার ১৩৪ জনসহ), নির্মাণ খাতে ১ হাজার ৩৫০ জন, পরিবহন ১ হাজার ২৯৭ জন, সেবা খাতে ৯৯৮ জন এবং কৃষি খাতে ২৪৬ জনসহ সর্বমোট ৫ হাজার ৮৭০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে।

২০২২-এ সারাদেশে ৫৪৭টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৭১২জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। পরিবহন খাতে ৩৩৩ জন, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান (যেমন- ওয়ার্কশপ, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ১৭০ জন, নির্মাণ খাতে ১০৪ জন, কৃষি খাতে ৬২ জন এবং বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে ৪৩ জন নিহত হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা; বিস্ফোরণ; বিদ্যুৎস্পৃষ্ট; বজ্রপাত; মাঁচা বা উপর থেকে পড়ে; শক্ত বা ভারী বস্তুর আঘাত; পানিতে ডুবে; আগুনে পুড়ে; বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে; পাহাড়, মাটি, ব্রীজ, ভবন বা ছাদ, দেয়াল ধসে এবং অন্যান্য কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কারণের তালিকা বেশ দীর্ঘ।

কয়েক মাস আগেই সীতাকুন্ড বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৫০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এইসব ঘটনা ঘটছে। অনিয়ম, অনুমোদনহীনতা, গাফিলতি এইসব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বিভিন্ন খাতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শিল্প খাতের মধ্যে বস্ত্র ও পোশাক, পাট, চা, কাগজ, সার, সিমেন্ট, চিনি, রড, পানীয়, সাবান ও ডিটারজেন্ট, পাথর এবং চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য শিল্প প্রধান। শিল্প খাতের মধ্যে উৎপাদন খাতের প্রাণ ছোট-বড় কলকারখানা। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের শ্রমিকরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে নিয়মিতভাবে।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে পোশাক শিল্পের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। কিন্তু কিছু বড় কমপ্লায়েন্স কারখানা ছাড়া ছোটখাটো কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এখনো অবহেলিত।

বর্তমানে পোশাক শিল্পে ৬০ শতাংশ নারী কাজ করছেন। প্রসূতিকালীন সুযোগ-সুবিধা নারী শ্রমিকদের অধিকার। বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসব পূর্ববর্তী ৮ সপ্তাহ এবং প্রসব পরবর্তী ৮ সপ্তাহ-মোট ১৬ সপ্তাহ ছুটি থাকার কথা এই সময়ে। আর্থিক সুবিধাও থাকার কথা। সেইসাথে এরকম ব্যক্তিদের হালকা কাজ করানোর বিধি-বিধান রয়েছে। বাস্তবে চিত্র কিন্তু ভিন্ন। নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন সুযোগ সুবিধা না দিয়ে জোরপূর্বক তাদের চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয় বা কাজের এত চাপ দেয়া হয় যে তারা নিজেরাই কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়। তাছাড়া সার্বিকভাবে পোশাকশিল্পে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয় এখনো প্রত্যাশিতভাবে মানা হচ্ছে না। নারী শ্রমিকরা এখনও বিভিন্ন রকমের সহিংসতা ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধন ২০২২) অনুযায়ী যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ৫ সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। আশা করা যায় এই ধরনের উদ্যোগ নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারী খাত অনেক পুরনো একটি খাত। ৭০ বছরের পুরনো এই খাতের শ্রমিকরাও অনেক অবহেলিত। হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে চামড়া নগরী স্থানান্তর তাদের জীবনমান আরো দুর্বিষহ করেছে। চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশেরশিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করছে, যাদের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী। এই খাতে ক্যামিকেল ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু সেসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা কম গুরুত্ব পায়।

জাহাজভাঙা ও নির্মাণখাত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ খাত। এই দুটি খাতের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক বেশি। এই খাতগুলোতে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান, ব্যবহার ও নিয়ম নীতি পালনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে তদারকিতে সমস্যা

প্রাতিষ্ঠানিক খাতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয় কোন না কোনভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তা কোনভাবে করা যায় না। ২০২২ সালে নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় প্রায় ১০৪ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়-পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকা, মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের পাশ দিয়ে লোহার রড উঠানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, উপর থেকে পড়ে যাওয়া, ভারী যন্ত্রপাতির আঘাত এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ব্যবহার না করা দুর্ঘটনার উল্লেখযোগ্য কারণ।

পাথরভাঙা শ্রমিকদের একটা বড় অংশ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছে। এই সেক্টরে 'সিলিকোসিস' নামে একটা পেশাগত ব্যাধি শ্রমিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর এলাকায় অবস্থিত পাথরভাঙা শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উপর এসআরএস পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, পেশাগত ঝুঁকি ও বিপত্তি সম্পর্কে ৮০ শতাংশ শ্রমিকের কোন ধারণা নেই, দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকরা পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা পান না, প্রায় ৮৫ শতাংশ শ্রমিক কোন প্রকার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পান না। পাথরভাঙা খাতের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাটগ্রামে একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল এর জন্য এ্যাডভোকেসি করা হচ্ছে। কেবল লালমনিরহাট নয়, পঞ্চগড়েও একটা বড় শ্রমশক্তি পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার বাইরে রয়েছে।

তাছাড়া কৃষি ও সেবামূলক খাতের লাখ লাখ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে। ২০২২ সালে পরিবহন সেক্টরে ৩৩৩ জন (চালক ও হেল্পার) শ্রমিক দায়িত্বরত অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগে বাধা, বেপোরোয়া যান চলাচল ও গাড়ি চালানোতে দক্ষতার অভাব পরিবহন দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানো চালকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অযথা গাড়ির হর্ন এবং শব্দের

মধ্যে কাজ করার ফলে মেজাজ খিটখিটে এবং দীর্ঘমেয়াদি শ্রবণশক্তি হারানোর সমস্যা দেখা দেয়। ২০২২ সালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সাইন্সের একটি গবেষণায় দেখা গেছে শব্দ দূষণের ফলে শ্রবণ সমস্যায় ভুগছেন রিকশা চালকরা; তারপরেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ ও লেগুনা চালকরা। শুধু এরকম মানুষরা নয়, সাধারণ মানুষ যাঁরা রাস্তায় চলাফেরা করে করে তারাও এই স্বাস্থ্যঝুঁকির বাইরে নয়। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জোরদার না করলে এবং দূষণের মাত্রা না কমালে সকলের জন্যই ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যেকটি খাতের মতো কৃষি খাতেও উপরিউক্ত সমস্যাগুলো কমবেশি আছে। এখাতে শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত। শ্রমিকরা এইসব কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রধান অর্থনৈতিক সেক্টর কৃষি, সেবা এবং শিল্পের রয়েছে অনেক সাব-সেক্টর এবং অসংখ্য শ্রমিক এইসব কাজের সাথে যুক্ত। শুধু বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে বিধায় কিছু সেক্টরকে গুরুত্ব না দিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সকলের জন্যই প্রয়োজন বলে মনে করা জরুরি।

আইনী বাধ্যবাধকতা, প্রতিবন্ধকতা ও সুপারিশ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা-

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫
- অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩
- বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড, ২০০৬
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইএলও গাইডলাইন
- বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৬
- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৯

শ্রম আইনের বিধানসমূহ

উপরিউক্ত বিষয়গুলো নিয়ে শ্রম আইনে অনেক দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন:

৪র্থ অধ্যায়- প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমাণ, পরিশোধ পদ্ধতি, চাকুরি অবসানে বাধা বিষয়ে

৫ম অধ্যায়- স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বায়ু চলাচল, ধুলা-বালি, ধোঁয়া, বর্জ্য অপসারণ, অতিরিক্ত ভীড়, আলোর ব্যবস্থা, পান করার পানি, শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ, আবর্জনা ও পিকদানি বিষয়ে

৬ষ্ঠ অধ্যায়- নিরাপত্তা: ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা, অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন, মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াত পথ, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, ধুলা ইতাদি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য বিষয়ে

৭ম অধ্যায়- স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান: বিপজ্জনক চালনা, দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ, কতিপয় ব্যাধি সম্পর্কে নোটিশ, বিপদের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ক্ষমতা, বিপজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান, কতিপয় কাজে মহিলা শ্রমিক নিয়োগের বাধা-নিষেধ

৮ম অধ্যায়- কল্যাণমূলক ব্যবস্থা: প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, সেইফটি কমিটি, বিশ্রাম কক্ষ, খাবার কক্ষ, শিশুকক্ষ, প্রতিবন্ধি শ্রমিকের আবাসন, চা-বাগানে গৃহায়ন সুবিধা, সংবাদপত্র কর্মীদের চিকিৎসা, বাধ্যতামূলক বীমা;

১২তম অধ্যায়- দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ: ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব, পরিমাণ, পদ্ধতি বিষয়ে

প্রতিবন্ধকতা

পরিস্থিতির উন্নয়নে নিম্নোক্ত বাধাগুলো দেখি আমরা:

- শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানে না
- সেইফটি কমিটি থাকে না
- প্রসূতিকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করা
- কর্মক্ষেত্রে আহত, নিহত শ্রমিক ও পরিবারকে সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা
- চিকিৎসা সেবা প্রদান না করা
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি না থাকা
- আইনী বিধি-বিধান না মানা

সুপারিশ

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান
- কর্মক্ষেত্রে আহত, নিহত শ্রমিক ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা
- যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অভিযোগ কমিটি গঠন
- শ্রম আইন ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

শেষ কথা

'নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হচ্ছে। শোভন কর্মপরিবেশ যেমন প্রতিটি শ্রমিকের অধিকার তেমনি তা নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব মালিক কর্তৃপক্ষের। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়তে সহায়তা করতে হবে সবাইকে। মালিকের দায়িত্ব যেমন এইসব বিষয় নিশ্চিত করা তেমনি তা পরিদর্শনের দায়িত্ব রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের। শ্রমিকদের অবশ্যই সঠিক নির্দেশনা মেনে কাজ করতে হবে। সরকার, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস প্লান

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান পি. ইঞ্জ
সদস্য, জাতীয় অস (অকুপেশনাল সেফ্‌টি ও হেল্‌থ) কমিটি
চেয়ারম্যান, অকুপেশনাল সেফ্‌টি বোর্ড অব বাংলাদেশ, আই ই বি

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবাক করা অর্জন আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি মোকাবিলার যোগ্যতা। আমেরিকা, জাপান বা ইউরোপসহ অন্যান্য উন্নত দেশেও বাংলাদেশের মত দুর্যোগ মোকাবিলায় পটুতা দেখাতে পারেনি। তবে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে আবহাওয়ার দুর্যোগগুলির ব্যবস্থাপনা পটুতার সাথে করতে পারলেও, বড় বড় শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দুর্যোগগুলির ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা, কি কি ধরনের দুর্যোগ হতে পারে সে সম্বন্ধেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অবগত নয়। এ কারণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানায় দুর্যোগের মাত্রার পরিমাণের সাথে সমান ব্যবস্থাপনা বা ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস প্লান যা সংক্ষেপে 'ইপিপি' প্রণয়ন ও প্রতিপালন প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান ও কারখানাসমূহের জন্য দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের জন্য বিপদের লেভেল ৪টি মাত্রায় নির্দিষ্ট করা যায় এবং দুর্যোগগুলির মাত্রা অনুধাবনের জন্য লেভেল-১ থেকে ৪ হিসাবে নামকরণ করা যেতে পারে।

দুর্যোগ লেভেল-১: এই লেভেল হলো কোন একটি স্থানে (প্রতিষ্ঠানের অফিসের একটি অংশে বা কারখানার কোন একটি প্রসেস ইউনিটে হতে পারে) দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এ দুর্ঘটনার ধরন ও মাত্রা এমন যে দুর্ঘটনাস্থলের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং অগ্নি নির্বাপণ বা অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলার যে ফ্যাসিলিটি সেখানে রক্ষিত আছে তার দ্বারাই দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম হবে। সাধারণত ছোটখাট আগুন, বা আহতের মাত্রা ফাস্ট এইডে যথেষ্ঠ, কোন কেমিক্যাল স্পিলের মাত্রা ভয়াবহ নয় অবস্থাসমূহ এই লেভেলে পড়ে।

দুর্যোগ লেভেল-২: এ দুর্ঘটনার ধরন ও মাত্রা এরূপ যে পুরো প্রতিষ্ঠান বা কারখনার সকল ব্যক্তিবর্গ এবং নিজস্ব যত ধরনের অগ্নি নির্বাপক ও দুর্যোগ মোকাবিলার যা কিছু আছে তা পরিমাণে ও সক্ষমতায় যথেষ্ঠ। পার্শ্ববর্তী কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের অথবা বাহিরের ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদির সাহায্যের প্রয়োজন নাই। এ ধরনের দুর্ঘটনা লেভেল-১ অপেক্ষা ভয়ানক। নিজস্ব যে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা আছে তার ব্যবহার প্রয়োজন হবে। বহুতল কোন ভবনের কোন একটি ফ্লোরে যদি আগুন/দুর্ঘটনা ঘটে, সেরূপ অবস্থায় যদি ভবনের সকল তলার ব্যক্তিবর্গ, যদি তা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন, এরূপ অবস্থার দুর্ঘটনা এই লেভেলের হতে পারে।

দুর্যোগ লেভেল-৩: এ দুর্যোগ লেভেল-২ অপেক্ষা আরও তীব্রতর ও ভয়ানক এবং এ দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এরূপ যে নিজ প্রতিষ্ঠান বা কারখানার জনবল, অগ্নি নির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থাসমূহ পরিমাণে ও সক্ষমতায় অপ্রতুল এবং পার্শ্ববর্তি প্রতিষ্ঠান ও কারখানাসমূহের সাহায্য প্রয়োজন হবে। কাছাকাছি ফায়ার সার্ভিস, এম্বুলেন্স ও হাসপাতাল সুবিধা প্রয়োজন।

দুর্যোগ লেভেল-৪: দুর্ঘটনার এ লেভেল হলো মহা-মহা বিপদ সংকেত এবং মহাদুর্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় সকল যন্ত্র, অগ্নি নির্বাপণের পাশাপাশি নিরাপত্তার ও শৃংখলার জন্য পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন। বিপদে নিপতিত প্রতিষ্ঠানের নিজেদের কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এমন কি প্রতিষ্ঠানের সম্পদসমূহ রক্ষার জন্য যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাও পূর্ণ বিপর্যয়ে নিপতিত হয়। সিকিউরিটি ও সেফ্‌টি বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নিজস্ব কর্তব্য পালনে নিরূপায় এবং তাদের নিজেদেরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যে টিম গঠন করা হয়েছিল, তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের পরিস্থিতি বা অবস্থা থাকে না। দুর্যোগ মোকাবিলার

পাশাপাশি উদ্ধার বা রেসকিউ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও হাসপাতালে স্থানান্তর ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস প্লান এর গুরুত্বঃ

ইপিপি এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষ করে যারা প্লান্টে কর্মরত, তারা প্লান্টের দুর্যোগের সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি বা উৎসগুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। নিজস্ব দায়িত্ব এবং দলীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব সম্বন্ধে তার নিজস্ব করণীয় বিষয়ে অবহিত হয়। ইমার্জেন্সি হান্ডলিং ইকুইপমেন্ট এবং কমিউনিকেশন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা ও সাহস অর্জিত হয়।

ইপিপি প্রস্তুত করার সময় মনে রাখতে হবে যে, সম্ভাব্য প্রতিটি দুর্যোগের ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বা নিয়ন্ত্রণের উপায় ও পদ্ধতি সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং সার্বিকভাবে সম্পূর্ণ হতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের নেতৃত্ব প্রদানকারীকে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ ও দলগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত থাকতে হবে। দলীয় এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতি ও তা নিরোধের উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য টেক্‌নিক্যাল সেশন এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে পটুতা, দক্ষতা দলীয় সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে ড্রিল করতে হবে। প্রশিক্ষণ এবং প্রাক্‌টিস হলো দক্ষতা ও পরিপক্কতা অর্জনের মূলমন্ত্র। যারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ কাজে সম্পৃক্ত তারা ব্যতিরেকে অন্য সবাই অবশ্যই দুর্যোগ এলাকা পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট স্থানে (Meeting point) অর্থাৎ যে নিরাপদ স্থানে (যা পূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়েছে) উপস্থিত হতে হবে। হেড কাউন্টিং এর মাধ্যমে উপস্থিতি গণনা করা হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন টিম যে নির্বাচন বা নির্ধারণ করা আছে, তারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হেলমেট পরতে পারে, ফলে কার কাজ কি তা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। টেলিফোন, ওয়াকিটকি, হ্যান্ড মাইক ও পাবলিক এড্রেস সিস্টেম সর্বদা সচল থাকতে হবে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে। এ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার পদ্ধতি জানা থাকতে হবে।

সম্ভাব্য দুর্ঘটনা / দুর্যোগের তালিকা প্রস্তুত করাঃ

যত ধরনের দুর্ঘটনা / দুর্যোগ হতে পারে তার প্রভাবসহ তালিকা প্রস্তুত করা। (ক) প্লান্ট অপারেশন / পরিচালন থেকে অথবা (খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এ দুই উৎস বা কারণ থেকে দুর্ঘটনা / দুর্যোগ হতে পারে। দুর্ঘটনা / দুর্যোগের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য (ক) পূর্ববর্তী দুর্ঘটনা ঘটার ইতিহাস (খ) এমনি একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা ঘটার ইতিহাস (গ) বিভিন্ন ধরনে হ্যাজার্ড এনালাইসিস (ঘ) প্লান্টে চাকুরিরত ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে প্রস্তাবিত সম্ভাব্য দুর্ঘটনা যা ঘটতে পারে ইত্যাদি নানা ধরনের এনালাইসিসের ও তথ্যের মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

তালিকাভুক্ত দুর্ঘটনা / দুর্যোগের ভয়াবহতা ক্ষতি সাধনে মাত্রা নির্ধারণঃ

প্রতিটি দুর্ঘটনা / দুর্যোগের ক্ষতি সাধনের ধরন / মাত্রা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে তাদের রিস্ক (ভয়াবহতা ও ঘটার সম্ভাবনা) পরিমাপ করা প্রয়োজন। হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের কোন তলায় আগুন লাগছে? প্রতিটি তলায় কত জন লোক কাজ করে? তারা ছেলে না মেয়ে? শিক্ষার মাত্রা কোন লেভেলের? প্রতিটি তলায় কি পরিমাণে ও ধরনের দাহ্য পদার্থ আছে? নিজস্ব ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা আছে কিনা? ফাইট করার মত জ্ঞান সমৃদ্ধ জনবল আছে কিনা? স্প্রিংকলার ও ফায়ার এলার্ম ব্যবস্থা আছে কিনা? পার্শ্ববর্তী বিল্ডিং এ আপদকালে যাওয়ার নির্গমণ ব্যবস্থা আছে কিনা ? ফায়ার ব্রিগেডের রেসকিউ অপারেশন করার সুযোগ কেমন আছে? ইত্যাদি।

দুর্ঘটনা / দুর্যোগের লেভেল নির্ধারণঃ

পূর্বে আমরা দেখেছি দুর্ঘটনার ৪টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে, এখন প্রত্যেকটি দুর্ঘটনাকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে (ক) দুর্ঘটনা ঘটার কারণসমূহ চিহ্নিত করতে হবে। (খ) কারণসমূহ চিহ্নিত হয়ে গেলে, তা নিরোধের জন্য কি কি পরীক্ষা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন তা স্থির করে নিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং (গ) এতদসত্ত্বেও যদি এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে যায় তা হলে (গ-১) দুর্ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য কি ব্যবস্থা বা পন্থা, (গ-২) দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিদের নিরাপদে বেরিয়ে আসার উপায় (গ-৩) দুর্ঘটনায় আহত ও আটকে পড়া ব্যক্তিবর্গকে উদ্ধার এবং (গ-৪) উদ্ধারকৃত আহত ব্যক্তিবর্গকে প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) প্রদান ও সংকটাময় অবস্থায় ব্যক্তিবর্গকে হাসপাতালে প্রেরনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

দুর্ঘটনা / দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় সম্পদ / যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করাঃ

প্রতিটি দুর্ঘটনা নিরোধ বা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করার জন্য কত জন ও কি ধরনের জনশক্তি ও কি কি টুলস, যন্ত্রপাতি ও রিসোর্স প্রয়োজন তা তালিকাভুক্ত করা এবং প্লান্ট বা স্থাপনায় এসব সুবিধা আছে কিনা? তা পরীক্ষা করা জনশক্তি বাদে অন্যান্য সকল কিছু ক্রয় বা জোগাড় করা প্রয়োজন। যথেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি না থাকলে প্রশিক্ষণ অথবা নিয়োগ প্রয়োজন হবে। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য ওয়াকিটকি বা কোন টর্চলাইট, এক্সটিংগুইসার, ফায়ার ওয়াটার নেটওয়ার্ক, ফায়ার মনিটর, হাইড্রান্ট হোস, ফোম ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভ, পাম্প, ইমার্জেন্সি সাইরেন, এম্বুলেন্স, হেলমেট, মাস্ক, ফায়ার ব্লাংকেট, গ্লোভস, ফাস্ট এইড, হ্যামার-ক্রাওবার, কাটার ইত্যাদি। এছাড়া পার্শ্ববর্তী ফায়ার ব্রিগেডসমূহ, থানা, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ,

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ববান উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ফায়ার ও সেফটি অফিসারের ফোন নাম্বার কন্ট্রোল রুম ও ফায়ার অফিসে থাকতে হবে।

দুর্ঘটনা / দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রণয়ন ঃ

প্রতিটি দুর্ঘটনার ভিন্নতার কারণে তাদের মোকাবেলার পদ্ধতি ভিন্নতর হয়। এ কারণে সম্ভাব্য প্রতিটি দুর্ঘটনা প্রতিরোধের পদ্ধতি সাবলিল, সহজবোধ্য তবে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত থাকতে হবে। দুর্ঘটনার ৪টি বিভিন্ন মাত্রার লেভেলের প্রয়োজনীয় জনশক্তির ধরন ও সংখ্যা ভিন্ন হবে। তবে প্রতিটি দুর্ঘটনা মোকাবেলার যে টিম তা ফায়ার সার্ভিসের (প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব), সিকিউরিটির অপারেশনের, মেইনটেন্যান্সের সেফটির, ইন্সট্রুমেন্টের বিভাগের লোকজন নিয়ে গঠিত হবে এবং প্রত্যেক লেভেলেরই টিম লিডার, দ্বিতীয় টিম লিডার ও তৃতীয় টিম লিডার নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। একজনের অনুপস্থিতিতে পরবর্তী ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম লিডার ইমার্জেন্সি ঘোষণা করবে এবং ইমার্জেন্সি সমাপ্তি ঘোষণ প্রদান করবে। এছাড়া ইমার্জেন্সি লেভেলের মাত্রা পরিবর্তিত মাত্রার টিম লিডারকে অবহিত ও তার উপস্থিতিতে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

ইমার্জেন্সি ডিক্লারেশন এবং টার্মিনেশন করা:

কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ঘটার সময় হয়তো দুর্ঘটনার লেভেল অনুযায়ী টিম লিডার ব্যক্তি হয়তো উপস্থিত নাও থাকতে পারেন। দুর্ঘটনা ঘটার সময় দায়িত্ববান অপারেশনের ব্যক্তি টিম লিডারের হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ইমার্জেন্সির ধরন ও লেভেলের উপর কাজের বিভিন্ন ধরন নির্ভর করে। এসব কাজ কিন্তু এককভাবে (যেমন ফায়ার পাম্প চালানো) আবার দলগতভাবে (ফায়ার ফাইট করা) আগুন নির্বাপণ প্রয়োজন। যেমন আহত বা আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার ও স্থানান্তর ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য একক ও দলগত দায়িত্বগুলি স্থির করা প্রয়োজন। প্রতিটি ইমার্জেন্সি সুন্দর, সুষ্ঠু ও প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে হ্যান্ডেল/ মোকাবিলা হবে তা নিশ্চিত করে একক ও দলগত দায়িত্বগুলো স্থির করতে হবে।

বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পদের দায়িত্ব:

প্রধান নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়কারী বিভিন্ন ইমার্জেন্সি লেভেল ঘোষণা নিশ্চিত করে। অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার কর্ম, ফাস্ট-এইড ইত্যাদি সকল কাজের পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাজ সহজ ও ত্বরান্বিত করা, বাহিরের সাহায্যকারী / অগ্নি নির্বাপণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, ভয়ানকভাবে আহত/অসুস্থ ব্যক্তিবর্গকে হসপিটালে প্রেরণ ইত্যাদি কাজ মনিটর ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে অপারেশন্স কন্ট্রোল রুমে গিয়ে হাজির হওয়া এবং ফায়ার ইনর্চাজের নির্দেশ মত স্থানে চলে যাওয়া এবং অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদন করতে হবে। এছাড়া বাহিরের যারা দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য আসবে তাদের সাহায্য করা এবং তাদের সাথে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকর্মে সম্পৃক্ত হতে হবে।

ইমার্জেন্সি ঘোষণা:

দায়িত্ব চলাকালীন দুর্ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যক্তি সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইমার্জেন্সি লেভেল অনুধাবন করবে এবং ইমার্জেন্সি ঘোষণা করবে। পরবর্তী প্রধান নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়কারী (প্রনিস) ইমার্জেন্সি লেভেল ঘোষণা নিশ্চিত করবেন। ইমার্জেন্সির পর প্রনিস ইমার্জেন্সি ম্যানেজারের সাথে আলোচনাক্রমে ইমার্জেন্সি সমাপ্তি ঘোষণা প্রদান করবেন। ইমার্জেন্সি সমাপ্তির সাথে দুর্ঘটনায় আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের যথেষ্ট চিকিৎসাসেবা এবং পরবর্তীতে পুনর্বাসন অতীব জরুরি। ইমার্জেন্সি সমাপ্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন। দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে।

ইভাকুয়েশন ব্যবস্থাপনা:

ইপিপিতে যেভাবে ইভাকুয়েশন বলা আছে এবং যেভাবে ইভাকুয়েশন ড্রিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। বহুতল ভবনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজে নিচে নেমে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে পরের ব্যক্তিবর্গের নামার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া উচিত। আহত বা আটকিয়ে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করা উচিত যাতে করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধার কর্মীরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

আহতদের যত দ্রুত সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এম্বুলেন্সের মাধ্যমে হাসপাতালে স্থানান্তর:

(ক) গুরতর আহত ব্যক্তিবর্গ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এম্বুলেন্সের মাধ্যমে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। এ ধরনের আহত ব্যক্তিকে কোন সময়ই একা রেখে যাওয়া উচিত নয়। ঘন ঘন বমি করলে খাড়া করে বসিয়ে রাখতে হবে। কোন ভাবেই বমি নাকের ভিতর যাতে না যায়, সেরূপ অবস্থায় রাখতে হবে। শোয়া অবস্থায় থাকলে কাত করে রাখতে হবে।

(খ) পড়ে যাওয়া / ফ্রাক্চার হওয়া ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তাদের বেশি নড়াচড়া না করানোই শ্রেয়।

(গ) ইলেক্ট্রিক শক্ খাওয়া ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত করতে হবে তা সুইচ বন্ধ করে হোক বা ভিকটিমকে সরিয়ে নিয়ে হোক, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা ও হার্ট পাম্পের চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) পুড়ে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ পরিষ্কার পানি দিয়ে যতদূর সম্ভব ঠান্ডা করতে হবে। অতিরিক্ত পুড়ে যাওয়া জায়গায় পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। পুড়ে যাওয়া জায়গায় পানি ছাড়া অন্য কিছু লাগানো যাবে না। পুড়ে যাওয়া কাপড় চোপড় না খোলাই শ্রেয়।

(ঙ) অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ রোধ করার জন্য প্রেস-ব্যান্ডেজ দিতে হবে ক্ষত স্থান উপরের দিকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে স্থানান্তর প্রয়োজন হবে।

(চ) চোকিং বা গলায় কোন কিছু আটকিয়ে যাওয়া ভিকটিমকে বমি করানোর চেষ্টা করা উচিত। কোনভাবেই পিঠে চাপড় মারা উচিত নয় এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

(ছ) জ্ঞান হারানো ব্যক্তিদের মাথা কিছুটা উঁচু করে কাত করে শোয়ানো উচিত। যাতে করে বমি করলে নাকের উপর না পড়ে।

(জ) হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়া রোগীর পাল্‌স ও রক্তচাপ অনবরত পরীক্ষায় রাখা উচিত।

(ঝ) রাসায়নিক দুর্ঘটনা আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে যে কেমিক্যাল দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তার এমএসডিএসের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইমার্জেন্সি কন্ট্রোল সেন্টারঃ

বহুতল অফিস বা কারখানায় একটি নির্দিষ্ট কক্ষ ইমার্জেন্সি অফিস কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এ কক্ষে সব ধরনের কথোপকথনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ি থাকবে। প্রয়োজনীয় সকল টেলিফোন নম্বর, ইপিপি এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল ড্রয়িং, লে-আউট প্লান, ভয়ানক ধরনের ম্যাটেরিয়ালের 'এসডিএস' ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপসংহারঃ

কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও অফিস এবং আমাদের দেশের বহুতল আবাস ভবনসমূহে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতির কালচার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। এ কালচার প্রতিষ্ঠিত করতে সরকার সংঘবদ্ধ ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস প্লান কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বহুতল ভবনের জন্য বাধ্যতামূলক করতে পারে আর প্রতিষ্ঠান বা বহুতল ভবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ঘন ঘন ড্রিলের মাধ্যমে তা রপ্ত করতে পারে। তবে আশার কথা কারখানা ও প্রতিষ্ঠান ও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে তদারকির কারণে গার্মেন্টস সেক্টরে দুর্ঘটনা বা দুর্যাগের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

আলোকচিত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২৮/০৪/২০২২)

বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল ২০১৯-এর বাংলা ভার্সনের মোড়ক উন্মোচন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২২/০১/২০২৩)

'Implementation of National Plan of Action (NPA) Towards Achieving Social Compliance in the Tannery Industrial Estate (TIE)'- এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২৫.৪.২০২২)

পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০৩০)-এর বাংলা ভার্সনের মোড়ক উন্মোচন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২২/০১/২০২৩)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি (২৮/০৪/২০২২)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ১১তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২)-এর মোড়ক উন্মোচন (২৪/১০/২০২২)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের Labour Inspection Report (2021-2022)-এর মোড়ক উন্মোচন (২৪/১০/২০২২)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা (২৬/১০/২০২৩)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নির্মাণাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

ওয়েবসাইট: www.dife.gov.bd

International Labour Organization

Canada

Kingdom of the Netherlands